সিএসপিএস প্রকাশনা – ৯

‘সাম্প্রতিক সময়ের বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সমস্যা’ প্রসঙ্গে দলিলপত্র, সুধীজনের বক্তব্য ও পরিস্থিতির মূল্যায়ন

প্রকাশক ঃ
সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক এণ্ড পিস স্টাডিজ
(সিএসপিএস)

'সাম্প্রতিক সময়ের বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সমস্যা'
প্রসঙ্গে দলিলপত্র, সুধীজনের বক্তব্য ও পরিস্থিতির মূল্যায়ন

রবিবার ১৩ মে ২০০১ তারিখে সিরডাপ মিলনায়তনে
সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক এণ্ড পিস স্টাডিজ (সিএসপিএস) কর্তৃক আয়োজিত
সেমিনার-কাম-গোলটেবিল আলোচনা'র উপর ভিত্তি করে প্রণীত পুস্তিকা।

আলোচনার সভাপতি ঃ
কমোডর (অবঃ) এম আতাউর রহমান
চেয়ারম্যান, সিএসপিএস

আলোচনার মডারেটর বা সমন্বয়ক ঃ
মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, বীর প্রতীক, এডব্লিউসি, পিএসসি
নির্বাহী পরিচালক, সিএসপিএস

প্রকাশক ঃ
সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক এণ্ড পিস স্টাডিজ (সিএসপিএস)
বাড়ী নং – ১২, রোড – ১, ব্লক – আই, বনানী, ঢাকা-১২১৩
ফোন ও ফ্যাক্স ঃ ৮৮২১২১৩, ই-মেইল ঃ csps@bangla.net
ওয়েবসাইট ঃ http://www.cspsdhaka.org

১০ জুলাই ২০০১ইং

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

বিগত তিরিশ মাসে 'সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক এণ্ড পিস স্টাডিজ (সিএসপিএস)' কর্তৃক দশটি ভিন্ন আঙ্গিকে সেমিনার বা গোলটেবিল আলোচনা আয়োজন করা হয়। তন্মধ্যে নির্বাচনে নিরাপত্তা সম্পর্কিত গোলটেবিল আলোচনাগুলো উল্লেখযোগ্য। এই আলোচনাগুলোর সারমর্ম ও সুপারিশ সম্বলিত প্রকাশনাসমূহ যথাযথ সময়ে প্রকাশ করা হয়।

সেমিনার বা গোলটেবিল আলোচনাসমূহের ধারাবাহিকতায় বিগত ১৩ মে ২০০১ তারিখে সিরডাপ মিলনায়তনে 'সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সমস্যা' বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ মে ২০০১ তারিখে ঢাকা থেকে প্রকাশিত ১৪টি বাংলা পত্রিকা এবং ৪টি ইংরেজি পত্রিকা ঐ সেমিনারের আলোচনা কম-বেশী আকারে দেশবাসীর নিকট পরিবেশন করেন.। ১৩ মে ২০০১ তারিখে আলোচক ও উপস্থিত সুধীজনের নিকট বিতরণকৃত কিছু দলিলপত্র এবং আলোচনার সারমর্ম দেশবাসীর সুবিধার্থে সিএসপিএস প্রকাশনা-৯ (তারিখ ১০ জুলাই ২০০১)-তে প্রকাশ করা গেল।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সম্পর্কিত সমস্যাবলী, বলতে গেলে, সর্বসাধারণের নিকট খুবই কম পরিচিত। পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সেমিনারটি আমাদেরকে অনেক নতুন বাস্তবতার সন্ধান এনে দেয়। এছাড়া সুধী সমাজের মনের প্রকৃত চিন্তা আমরা জানতে পারি। যাতে করে ভবিষ্যতে এ জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে আমরা আরও সচেতন হতে পারি এবং সজাগ দৃষ্টি রাখতে পারি, সেই প্রেক্ষাপটে গণ সচেতনতা ও আগ্রহ সৃষ্টির আঙ্গিকে, সেমিনারটি একটি সফল প্রয়াস ছিল। সিএসপিএস সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট ঃ http://www.cspsdhaka.org –এ ভ্রমণ করুন অথবা ই-মেইল ঃ csps@bangla.net – এ যোগাযোগ করুন।

নিবেদক
মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, বীর প্রতীক
নির্বাহী পরিচালক, সিএসপিএস
১০ জুলাই ২০০১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ক.	সেমিনারে উপস্থাপিত দলিলসমূহ	
১.	বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চিহ্নিতকরণ চুক্তি – মে ১৯৭৪	৭
২.	সীমানা নির্ধারণ	১৩
৩.	বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত কর্তৃপক্ষের জন্য যৌথ নির্দেশাবলী ১৯৭৫	২৪
৪.	ভারতের সাথে সীমান্ত চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত কিছু তথ্য	৩২
খ.	১৩ মে ২০০১ তারিখে আলোচনায় উপস্থিত আলোচকবৃন্দের আলোচনার সারমর্ম	৩৪
গ.	১৩ মে ২০০১ তারিখে আলোচনায় উপস্থিত আলোচকবৃন্দের তালিকা ও পরিচয়	৭৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১৩ই মে ২০০১ রবিবার সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক এন্ড পিস স্টাডিজ (সিএসপিএস) কর্তৃক সিরডাপ মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ-ভারত সাম্প্রতিক সীমান্ত সমস্যা' শীর্ষক উন্মুক্ত সেমিনার/আলোচনাতে সম্মানিত অংশগ্রহণকারীদের আলোচনায় সহায়তার জন্য নীচের ৪টি দলিল Information Paper বা অবহিত পত্র হিসেবে উপস্থাপিত। অনানুষ্ঠানিক উৎস থেকে সংগৃহীত এবং ইংরেজী থেকে অনানুষ্ঠানিকভাবে অনুদিত।

প্রথম দলিল

বাংলাদেশ-ভারত ভূখণ্ডের সীমানা চিহ্নিতকরণ চুক্তি - মে ১৯৭৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকার দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট এলাকা অধিকতর সঠিকভাবে নির্ধারণ এবং ভূখণ্ডের সীমানা চিহ্নিতকরণে কাঙ্খিত হয়ে নিম্নে উল্লেখিতভাবে সম্মত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ-১

বাংলাদেশ ও ভারতের নিম্নে উল্লেখিত অঞ্চলগুলোর সীমানা নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে চিহ্নিত করা হবে।

১। মিজোরাম-বাংলাদেশ সেক্টর ঃ সর্বশেষ দেশ বিভাগ-পূর্বকালের বিজ্ঞপ্তিসমূহ ও নথিপত্রের ভিত্তিতে সীমানা চিহ্নিতকরণ সম্পন্ন করতে হবে।

২। ত্রিপুরা-সিলেট সেক্টর ঃ ঐকমত্যের ভিত্তিতে এই অঞ্চলের সীমানা চিহ্নিতকরণে এরই মধ্যে যে অগ্রগতি হয়েছে তা যথাশীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করতে হবে।

www.pathagar.com

৩। ভাগলপুর রেলওয়ে লাইন ঃ পূর্বগামী রেলওয়ে বাঁধের প্রান্ত মুখী ৭৩ ফুট সমান্তরাল দূরত্বে সীমানা চিহ্নিত করতে হবে।

৪। শিবপুর-গৌরাঙ্গগালা সেক্টর ঃ ১৯১৫-১৯১৮ সালের জেলা ভূমি জরিপ মানচিত্রের ভিত্তিতে ১৯৫১-৫২ সালে শুরু করা প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে সীমানা চিহ্নিত করতে হবে।

৫। মুহুরী নদী (বিলোনিয়া) সেক্টর ঃ এ অঞ্চলের সীমানা, চিহ্নিতকরণের সময় মুহুরী নদীর মাঝপ্রবাহ বরাবর, চিহ্নিত করতে হবে। এ সীমানাই হবে স্থায়ী। দুই সরকার নদীটির গতিধারা অপরিবর্তিত রাখার লক্ষ্যে নিজ নিজ অংশে বাঁধ নির্মাণ করবে।

৬। ত্রিপুরা-নোয়াখালী/কুমিল্লা সেক্টরের বাদবাকী অংশ ঃ এ সেক্টরের সীমানা চিহ্নিতকরণ ১৮৯২-৯৪ সালের চাকলা-রোশনাবাদ এস্টেট মানচিত্রের ভিত্তিতে হবে এবং এতে অনুল্লেখিত অঞ্চলসমূহের সীমানা জরিপ জেলা ভূমি মানচিত্রের (১৯১৫-১৮) ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

৭। ফেনী নদী ঃ সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ম্যাপ শিট নং ৭৯ এম/১৫, ১ম সংস্করণ ১৯৩৫ সালের জরিপে উল্লেখিত ফেনী নদীর ঐ শাখা চিহ্নিতকরণের সময় মাঝপ্রবাহ বরাবর সীমানা চিহ্নিত করা হবে। উল্লেখিত মানচিত্রের এ নদীকে এখনও আসালং সি (মানে আসালং ছড়া)-তে প্রবাহিত দেখানো হয়েছে। সীমানা চিহ্নিত করার সময় ভাটির ঐ স্থান থেকে ফেনী নদীর মাঝপ্রবাহ বরাবর সীমানা চিহ্নিত করা হবে। এ সেক্টরে এই সীমানা হবে স্থায়ী।

৮। ত্রিপুরা-পার্বত্য চট্টগ্রাম সেক্টরের বাকী অংশ ঃ সীমানা, উপরের ৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ফেনী নদীর ঐ শাখার মাঝপ্রবাহে গ্রিড (Grid) রেফারেন্স ০০৯৭৭৯ পর্যন্ত অনুসৃত হবে (উপরের ৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ম্যাপশিট অনুযায়ী), যেখান থেকে সীমানা পূর্ব প্রান্তবর্তী জলস্রোতের

www.pathagar.com

মাঝপ্রবাহে অনুসৃত হবে। এই জলস্রোতের উৎস থেকে সীমানা রেখা চলে যাবে উপরে উল্লেখিত মানচিত্রে বর্ণিত বায়ান আসালং জলস্রোতের মাঝপ্রবাহের স্বল্প দূরত্ব দিয়ে এবং অতঃপর সীমারেখা সংযোগস্থলে এর উৎসে না পৌঁছা পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এই নদীর মাঝপ্রবাহ বরাবর এগিয়ে যাবে (উপরে উল্লেখিত মানচিত্রের গ্রিড রেফারেন্স ০৪৬৮১০ নির্দেশিত)। সেখান থেকে সীমারেখা সংযোগস্থলের শীর্ষ বরাবর চলে যাবে ভগবান ট্রিগ স্টেশন পর্যন্ত। সীমারেখা ভগবান ট্রিগ স্টেশন থেকে বাংলাদেশ-আসাম-ত্রিপুরা সীমান্তের ত্রিমুখী-জংশন পর্যন্ত (খান তালাং ট্রিগ স্টেশন) দু'দেশের নদী প্রবাহের অববাহিকার বিভাজক রেখা বরাবর চলে যাবে। মানচিত্র ও ভূমির অবস্থানের মধ্যে কে'নো পার্থক্য থাকলে সেক্ষেত্রে ভূমিই প্রাধান্য পাবে। এ সেক্টরে সীমানা হবে স্থায়ী।

৯। বিয়ানীবাজার-করিমগঞ্জ সেক্টর ঃ উমাপতি গ্রাম ভারতে ফেলে এই গ্রামের পশ্চিম সীমানার অচিহ্নিত করা অংশ চিহ্নিতকরণে সম্মত ভিত্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চিহ্নিত করা হবে।

১০। হাকার খাল ঃ ইছামতি নদী থেকে পৃথক করে হাকার খালকে একটি ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে ১৯৫৮ সালের নেহেরু-নুন চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সীমানা চিহ্নিত করা হবে। এ সীমানা হবে স্থায়ী।

১১। বৈকারী খাল ঃ বৈকারী খালের ক্ষেত্রে, সীমানা ১৯৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ভূমি নথিভুক্তি ও জরিপের পরিচালকদের মধ্যে সম্পাদিত বা সম্মত নীতিমালা অনুযায়ী করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ভূমি প্রাধান্য পাবে।

১২। ছিটমহলগুলো ঃ ১৪ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ছিটমহলগুলো ব্যতীত বাংলাদেশে ভারতীয় ছিটমহল এবং ভারতে বাংলাদেশের ছিটমহলগুলো অতিসত্ত্বর বিনিময় করতে

www.pathagar.com

হবে। বাংলাদেশে যে বাড়তি এলাকা পড়বে তার জন্য ক্ষতিপূরণ চাওয়াও যাবে না, দেওয়াও হবে না।

১৩। হিলি ঃ এ অঞ্চল র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ ও র‍্যাডক্লিফ কর্তৃক মানচিত্রে আঁকা রেখার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চিহ্নিত করা হবে।

১৪। বেরুবাড়ী ঃ ভারত দক্ষিণ বেরুবাড়ী ইউনিয়ন নং ১২ এর দক্ষিণ দিকস্থ অর্ধাংশ ও পাশ্ববর্তী ছিটমহলগুলোর অধিকারী হবে, যে এলাকার পরিমাণ প্রায় ২.৬৪ বর্গমাইল এবং বিনিময়ে বাংলাদেশ দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা ছিটমহলের অধিকারী হবে। বাংলাদেশের পানবাড়ী মৌজার (পাটগ্রাম থানা) সঙ্গে দহগ্রামকে সংযুক্ত করার জন্য ভারত বাংলাদেশকে 'তিন বিঘা' নামক স্থানের নিকট ১৭৮ মিটার X ৮৫ মিটার এলাকা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেবে।

১৫। লাঠিটিলা-ডুমাবাড়ি ঃ সর্বশেষ চিহ্নিত সীমানা পিলারের অবস্থান পয়েন্ট Y থেকে, পাথেরিয়া হিলস বরাবর দক্ষিণ অভিমুখী সেই পয়েন্ট পর্যন্ত যাবে যেখানে এ সীমারেখা ডুমাবাড়ি মৌজার পশ্চিম সীমানায় মিলিত হয়। অতঃপর ডুমাবাড়ি ও লাঠিটিলা মৌজাদ্বয়ের জংশন হয়ে ডুমাবাড়ি মৌজা বরাবর ডুমাবাড়ি, লাঠিটিলা ও বড় পুতনিগাঁও মৌজাত্রয়ের জংশন পর্যন্ত যাবে। এ পয়েন্ট থেকে সীমারেখা পুতনি চরের মাঝপ্রবাহে মিলিত হতে স্বল্প দূরত্ব বরাবর এগিয়ে যাবে। অতঃপর বরাবর এগিয়ে যাবে। অতঃপর সিলেট (বাংলাদেশ) ও ত্রিপুরা (ভারত)-এর মধ্যকার সীমানায় মিলিত হওয়া অবধি চিহ্নিতকরণের সময়ে সীমারেখা পুতনির গতিপথের মাঝপ্রবাহ বরাবর দক্ষিণ দিকে এগুবে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ-২

বাংলাদেশ ও ভারত সরকার সম্মত হয়েছে যে, অঞ্চলগুলোর বিপরীত অবস্থানের যে ভূখণ্ড এরই মধ্যে চিহ্নিতকরণ হয়ে গেছে, যার সীমারেখা মানচিত্রও এর মধ্যে প্রস্তুত হয়েছে, সীমারেখা মানচিত্রগুলোতে পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের স্বাক্ষরের ছয় মাসের মধ্যে সেগুলো বিনিময় করতে হবে। উভয় সরকার কর্তৃক চুক্তি অনুমোদন বা রেটিফিকেশনের পর পরই তারা সংশ্লিষ্ট মানচিত্রগুলোতে যথাশীঘ্র সম্ভব স্বাক্ষর করবেন (এই স্থলে ব্রাকেটের মধ্যকার আন্ডারলাইন করা কথাগুলো ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৬-২৯ তারিখের সংশোধনীর মাধ্যমে অপসারিত হয়েছিল এবং তার পরিবর্তে ব্রাকেটের বাইরে স্বাভাবিক নিয়মে ছাপানো কথাগুলো প্রতিস্থাপিত হয়েছিল "এবং কোনো ক্ষেত্রেই ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭৪ সালের পরে নয়")। অন্য অঞ্চলে যেখানে এরই মধ্যে সীমান্ত চিহ্নিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে তাসহ মানচিত্রগুলো ছাপানোর ব্যাপারে ত্বড়িত পদক্ষেপ নিতে হবে। এগুলো ৩১ মে ১৯৭৫ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে হবে। যে সব সেক্টরে ভূখণ্ড হস্তান্তরের বিষয়টি এখনও চিহ্নিত করা হয়নি তা সংশ্লিষ্ট সীমারেখা মানচিত্রগুলোতে পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের স্বাক্ষরের ছয় মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৩

বাংলাদেশ ও ভারত সরকার সম্মত হয়েছে, যে অঞ্চলগুলো হস্তান্তর করা হবে, সে সব অঞ্চলের জনগণকে মালিকানা হস্তান্তরিত জায়গায় বা অঞ্চলের মধ্যে অবস্থান করার অধিকার দেয়া হবে ঐ রাষ্ট্রটিরই নাগরিক হিসেবে, যে রাষ্ট্রে অঞ্চলগুলো হস্তান্তর করা হয়েছে। সীমানা চিহ্নিতকরণ ও ভূখণ্ড বিনিময় পারস্পরিক সম্মতির মধ্যে দিয়ে করতে হবে, এ ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থার কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করা যাবে না এবং সীমান্ত অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বজায় রাখতে হবে। দু'দেশ এ ব্যাপারে সীমান্ত অঞ্চলের স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবে।

অনুচ্ছেদ-৪

বাংলাদেশ ও ভারত সরকার সম্মত হয়েছে যে, এ চুক্তির ব্যাখ্যা অথবা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যে কোনো বিরোধ পারস্পরিক শলা-পরামর্শের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করা হবে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ-৫

চুক্তিটি বাংলাদেশ ও ভারত সরকার অনুমোদন করবে এবং অনুমোদনের দলিল যথাশীঘ্র সম্ভব বিনিময় করা হবে। অনুমোদনের দলিল বিনিময়ের তারিখ থেকে চুক্তিটি কার্যকর হবে।

১৬ মে, ১৯৭৪ সালে নয়াদিল্লীতে দু'টি মূল দলিলে স্বাক্ষর করা হয়, দলিলদ্বয়ের প্রতিটিই সমভাবে গ্রহণযোগ্য।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে

(শেখ মুজিবুর রহমান)
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের পক্ষে

(ইন্দিরা গান্ধী)
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দলিল

অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে ও ভিত্তিতে রচিত বাংলাদেশ-ভারত সীমানা নির্ধারণ ও ছিটমহল সংক্রান্ত সমস্যার উপর প্রতিবেদন, তারিখ ১২ এপ্রিল ২০০১। জানুয়ারী ২০০০ পর্যন্ত সঠিক বলে মোটামুটি বিবেচনা করা যেতে পারে।

সীমানা নির্ধারণ

১। বাংলাদেশ-ত্রিপুরা সেক্টর

(ক) মুহুরী নদী এলাকা ঃ

এই এলাকায় প্রায় ২ কি.মি. সীমানা নির্ধারণের কাজ বাকী আছে। ১৯৭৪ইং সালের মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি অনুযায়ী এই এলাকায় সীমানা নির্ধারণের সময় মুহুরী নদীর মাঝপ্রবাহকে সীমানা হিসাবে গণ্য করতে হবে। কিন্তু নদীর কোন স্থানের মাঝপ্রবাহ হতে সীমান্তরেখা আরম্ভ হবে তার উল্লেখ উক্ত চুক্তিতে নেই। ফলে মাঠ পর্যায়ে সীমানা নির্ধারণের সময় উভয় পক্ষের মধ্যে মতানৈক্য হয়। মুহুরী নদীর ২ কি.মি. ছাড়া অবশিষ্ট কুমিল্লা/নোয়াখালী-ত্রিপুরা সেক্টরে চাকলা-রোশনাবাদ মৌজা ম্যাপের উপর ভিত্তি করে সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং স্বভাবতই উক্ত চুক্তি অনুযায়ী মুহুরী নদী এলাকায় চাকলা-রোশনাবাদ ম্যাপের সীমান্তরেখা যে স্থানে মুহুরী নদী স্পর্শ করেছে সে স্থান হতে মাঝপ্রবাহ বরাবর সীমান্তরেখা টানা হবে বলে বাংলাদেশের পক্ষের দৃঢ় অভিমত। উক্তভাবে সীমানা নির্ধারণে ৪০-৫০ একর আয়তনের মুহুরী চরটি বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে শ্মশানঘাটের কিছু অংশ ভারতকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত সরকার '৮৮-'৮৯ সালের কোনো এক সময় গ্রহণ করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল সমস্যাটির সমাধানের জন্য কিছু ত্যাগ করে হলেও পরিবেশ সৃষ্টি করা। কিন্তু ভারত বাংলাদেশের প্রস্তাবে সম্মত হয়নি। অন্যদিকে ভারতীয় পক্ষ একটি সুনির্দিষ্ট সীমানাস্তম্ভ হতে সরাসরি দাগ টেনে নদীর মাঝপ্রবাহ বরাবর সীমানা চিহ্নিত করার পক্ষে। এইভাবে সীমানা নির্ধারিত হলে উপরোক্ত পরিমাণ ভূমি ভারত লাভ করবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তিন বিঘা করিডোর বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর এবং মুহুরী নদী এলাকায় সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে উভয় দেশের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে অক্টোবর

www.pathagar.com

'৮০-তে দিল্লীতে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উক্ত বৈঠকে সমঝোতা হয় যে তিন বিঘা করিডোর বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর এবং মুহুরী নদী এলাকায় সীমানা নির্ধারণ একই সময় সম্পন্ন করতে হবে।

গত ২৬ জুন '৯২ তারিখে তিন বিঘা করিডোর বাংলাদেশের জন্য খুলে দেয়ার পর ভারতীয় জরিপপক্ষ মুহুরী নদী এলাকায় সীমানা নির্ধারণ সম্পন্ন করার জন্য প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সীমানা নির্ধারণের নীতিগত বিষয়ে উভয় পক্ষের মতানৈক্য থাকার ফলে মুহুরী নদী এলাকায় সীমানা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি আজ অবধি নিষ্পত্তি হয়নি এবং মাঝে মধ্যেই ঐ এলাকায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

২। বাংলাদেশ - পশ্চিমবঙ্গ সেক্টর

(ক) বেরুবাড়ী এলাকা ঃ

বেরুবাড়ী এলাকায় ৬৩ কি.মি. সীমানার মধ্যে ৩২ কি.মি. সীমানা চিহ্নিত করার কাজ ইতিপূর্বে সীমানাস্তম্ভ নির্মাণের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৩১ কি.মি. এলাকায় সীমানা নির্ধারণ কর্মসূচী ইতিপূর্বে একাধিকবার প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু ভারতীয় স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক বাধাদানের ফলে সীমানা চিহ্নিতকরণ সম্ভব হয়নি। তবে গত ৩-৪ বছর পূর্বে দৈখাতা মৌজায় ১.৫০ কি.মি. ছাড়া ২৯.৫০ কি.মি. সীমানা অস্থায়ী চিহ্ন দ্বারা নির্ধারণ করা হয়েছে। অতঃপর এই এলাকায় স্ট্রীপ ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে বেরুবাড়ী সীমানার ৫টি স্থানে যথা - কাজলদীঘি, পরাণী গ্রাম, নাওতরী দেবোত্তর, দৈখাতা, বড়সশী, নাওতরী নবাবগঞ্জ এবং চিলাহাটী মৌজা ১২৫৩.৫৯ একর বাংলাদেশের জমি ভারতের অপদখলে রয়েছে। ভারতীয় অপদখলকারীদের বাধা প্রদানের ফলে সীমানাস্তম্ভ নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া ভারতের প্রায় ২৬০.৫৫ একর জমি বাংলাদেশের অপদখলে আছে।

(খ) সিংপাড়া-ক্ষুদিপাড়া ঃ

পঞ্চগড় জলপাইগুড়ি সীমান্তে সিংপাড়া-ক্ষুদিপাড়া এলাকায় ১৩ কি.মি. সীমানার মধ্যে ৬ কি.মি. ইতিপূর্বে পিলার নির্মাণের মাধ্যমে সীমানা নির্ধারণ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৬ কি.মি. অস্থায়ী চিহ্ন দ্বারা সীমানা নির্ধারণ শেষ হয়েছে। ভারত রাজী না হওয়ার কারণে এই ৬ কি.মি. এলাকায় সীমান্তস্তম্ভ নির্মাণ সম্ভব হয়নি। স্তম্ভগুলো

www.pathagar.com

কোথায় স্থাপন করা হবে তার স্থানাংক নির্ণয় করা হয়েছে। সিংপাড়া এবং ক্ষুদিপাড়া এলাকায় সর্বমোট ১২১.৪০ একর বাংলাদেশের জমি ভারতের অপদখলে আছে। ভারতীয় অপদখলকারীদের বাধা প্রদানের জন্য ৬ কি.মি. এলাকায় সীমানাস্তম্ভ নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই এলাকায় স্ট্রীপ ম্যাপ প্রস্তুতের কাজ শেষ হয়েছে।

অবশিষ্ট ৬ কি.মি. এলাকায় সীমানাস্তম্ভ নির্মাণ বিষয়টি নিষ্পত্তিহীন অবস্থায় রয়েছে।

(গ) মৌজা - দৈখাতা-থানা বোদা ঃ

বেরুবাড়ী এলাকা সংলগ্ন দৈখাতা মৌজার মালিকানা বিষয়ে ভারতীয় পক্ষের জরিপ কর্মকর্তাদের ভিন্নমত পোষণের কারণে উক্ত এলাকার সীমানা নির্ধারণ কাজ শুরু করা হচ্ছে না। বস্তুত সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র অনুযায়ী মৌজাটির মালিকানা নিম্নলিখিত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের ঃ-

(১) ১৯১০-১১ সালের সি.এস. জরিপ অনুযায়ী মৌজা দৈখাতা, থানা-বোদা, জেলা-জলপাইগুড়ির (বর্তমানে বৃহত্তর দিনাজপুরে) অন্তর্গত। সি. এস. জরিপের পর গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সেটা চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়। গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং-২৮০৫ পি.এল. তারিখঃ ২৮-৬-১৯২৫ অনুযায়ী দৈখাতা মৌজাটি বোদা থানার অন্তর্গত।

(২) ১৯৩৮ সালে কুচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে সীমানা নির্ধারণের লক্ষ্যে বাউন্ডারি কমিশন গঠিত হয়। বাউন্ডারি কমিশন সীমানাস্তম্ভ নির্মাণের মাধ্যমে কুচবিহার ও জলপাইগুড়ির মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করেন। সীমানা নির্ধারণ ম্যাপ ও বাউন্ডারি কমিশনের ১৯৩৯ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী মৌজা দৈখাতা নং-৫৬, থানা-বোদা, জেলা-জলপাইগুড়ির (বর্তমানে বৃহত্তর দিনাজপুরের) অন্ত র্গত।

(৩) উভয় দেশের পরিচালক পর্যায়ে প্রায় ৫০ বছর পূর্বে অনুষ্ঠিত একটি যৌথ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাউন্ডারি কমিশন ম্যাপের উপর ভিত্তি করে কুচবিহার-দিনাজপুর/রংপুর সেক্টরের সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। এ যাবত উক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারিত হয়ে আসছে। অতএব বাউন্ডারি কমিশন ম্যাপ অনুযায়ী দৈখাতা মৌজা বাংলাদেশের।

www.pathagar.com

(৪) মৌজা এবং থানা ম্যাপ অনুযায়ী দৈখাতা মৌজাটি বোদা থানার অন্তর্গত। কিন্তু ভারত ১৮৫৬-৫৯ইং সালের Pemberton ম্যাপ অনুযায়ী দৈখাতা মৌজাটি তাদের বলে দাবী করে আসছে, যা বাংলাদেশ পক্ষ যুক্তিসঙ্গত মনে করে না। কারণ সর্বশেষ সি. এস. জরিপের পর পূর্বের Pemberton জরিপের কোনো কার্যকারিতা থাকে না।

উল্লেখ্য যে, দৈখাতা মৌজার অধিকাংশ এলাকার (প্রায় ৭০ একর) বর্তমানে বাংলাদেশের দখলে আছে। এর মোট আয়তন ৯১ একর।

৩। বাংলাদেশ-আসাম সেক্টর ঃ

(ক) লাঠিটিলা-ডুমাবাড়ী এলাকা ঃ

বাংলাদেশ-আসাম সীমানার দৈর্ঘ্য ২৬৪ কি.মি.। ১৯৭৪ সালের মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি সম্পাদনের পর লাঠিটিলা এলাকায় ৭ কি.মি. সীমানা চিহ্নিতকরণ অবশিষ্ট ছিল। গত ১৯৮৭-৮৮ মাঠ মৌসুমে লাঠিটিলা এলাকায় পুতনিছড়া বরাবর ৪ কি.মি. সীমানা চিহ্নিতকরণ সম্পন্ন হয় এবং স্ট্রীপ ম্যাপও প্রস্তুত করা হয়।

লাঠিটিলা এলাকায় যে ৩ কি.মি. সীমানা নির্ধারণ বাকী আছে তা ডুমাবাড়ী মৌজা সংলগ্ন। বর্তমানে এই এলাকা বাংলাদেশের দখলে। এই মৌজার আয়তন প্রায় ১২০ একর। এখানে বাংলাদেশের ৪৫টি পরিবার বসবাস করে। মুজিব-ইন্দিরা চুক্তিতে ডুমাবাড়ী মৌজাটি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

জানামতে ডুমাবাড়ী মৌজা এলাকায় সীমানা নির্ধারণ করার জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও ম্যাপ ভারতের নিকট চাওয়া হয়েছিল। ভারত শুধু মৌজা ম্যাপ সরবরাহ করেছে। কিন্তু ট্রাভার্স রেকর্ড সরবরাহ করতে পারেনি। ভারত শুধু মৌজা ম্যাপের উপর ভিত্তি করে সীমানা নির্ধারণের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ট্রাভার্স রেকর্ড ছাড়া মৌজার ভৌগলিক অবস্থান কোথায় তা জানা সম্ভব না। তাই বাংলাদেশের তরফ হতে ট্রাভার্স রেকর্ড ছাড়া সীমানা নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত হবে না বলে অভিমত দেয়া হয়। উভয়পক্ষ এই বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছাতে না পারায় এর মীমাংসা হচ্ছে না।

www.pathagar.com

ছিটমহল

বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত ভারতীয় ছিটমহল এবং ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত বাংলাদেশের ছিটমহলের তালিকা চূড়ান্ত করে উভয় দেশের মহাপরিচালক পর্যায়ে গত ০৯-০৪-৯৭ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। উভয় দেশের সম্মত তালিকা অনুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ভারতের ছিটমহলের সংখ্যা ১১১টি এবং সেগুলোর আয়তন ১৭,১৫৮.১৩ একর। ভারতের মধ্যে অবস্থিত বাংলাদেশের ছিটমহলের সংখ্যা ৫১টি এবং সেগুলোর আয়তন ৭,১১০.০২ একর।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে, জরিপ বিভাগ কর্তৃক চূড়ান্তকৃত তালিকা মতে ১৯৭৪ সালের মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির ভিত্তিতে ছিটমহল বিনিময় চূড়ান্ত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব দেয়া হয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছিটমহল বিনিময় বিষয়ে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। ছিটমহল বিনিময় করতে ভারতের সংবিধান সংশোধন করতে হবে বলে জানানো হয়। ভারত এই বিষয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি।

অপদখলীয় এলাকা

১৯৭৪ সালের মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির অনুচ্ছেদ-২ অনুযায়ী উভয় দেশের অপদখলীয় এলাকা সংশ্লিষ্ট দেশের নিকট ছেড়ে দেয়ার দ্বি-পাক্ষিক সম্মতি স্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। এটা বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া এমনকি সময়সীমাও নির্ধারণ করে বলা হয়েছে যে, স্ট্রীপ ম্যাপ প্লেনিপোটেনশিয়ারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে অপদখলীয় এলাকা হস্তান্তর করা হবে। পরবর্তীতে ২৬-২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪ সময়ে, ভারতের প্রস্তাবে ও বাংলাদেশের সম্মতিতে উক্ত অনুচ্ছেদ সংশোধিত হয়। সংশোধনী অনুযায়ী ১৯৭৪ সালের চুক্তি উভয় দেশ কর্তৃক রেটিফাই হওয়ার পর স্ট্রীপ ম্যাপ প্লেনিপোটেনশিয়ারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে। মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি বাংলাদেশ রেটিফাই করলেও ভারত তা এখনো রেটিফাই করেনি। ফলে স্ট্রীপ ম্যাপ প্লেনিপোটেনশিয়ারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়নি এবং অপদখলকৃত এলাকাও হস্তান্তর করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, স্ট্রীপ ম্যাপ প্লেনিপোটেনশিয়ারী কর্তৃক স্বাক্ষর করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল, কিন্তু ভারতের নিকট থেকে সাড়া পাওয়া যায়নি।

www.pathagar.com

ভূমি নথিভুক্তি ও জরিপ অধিদপ্তরের '৯৭ সালের পূর্বের তথ্য অনুযায়ী ২৬৮৫.৬২ একর ভারতের জমি বাংলাদেশের অপদখলে এবং ৩২১৮.২০ একর বাংলাদেশের জমি ভারতের অপদখলে রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে হিসেবে গড়মিল দেখা যায়। নদী ভাঙ্গনের ফলেও হিসেবে তারতম্য হয়। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বর্তমানে বাংলাদেশের হিসাবমতে অপদখলীয় এলাকার তালিকা মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ-

সেক্টরের নাম	বাংলাদেশের অপদখলে	ভারতের অপদখলে	মন্তব্য
কুষ্টিয়া-নদীয়া *	১৫৯১.৮০ একর	১১৬৩.০০ একর	* ১৫৯১.৮০ একরের মধ্যে প্রায় ১১৬৪.৮৭ একর বর্তমানে নদীগর্ভে
পঞ্চগড়-জলপাইগুড়ি	২৬০.৫৫	১৩৭৪.৯৯	
কুড়িগ্রাম-গোয়ালপাড়া	১৬০.০০	-	
সিলেট-মেঘালয়	১৯৭.০৫	৪৬৩.১১	
সিলেট-কাছার	৫৮৯.৭০	১৭৪.২৮	
কুমিল্লা-নোয়াখালী-ত্রিপুরা	৫৫.২৮	১৩৬.৯২	
সিলেট-ত্রিপুরা	১১৯.৭৮	১৯৪.০১	
পঞ্চগড়-দার্জিলিং	৫০.০০	-	
মোট	৩০২৪.১৬ একর	৩৫০৬.৩১ একর	

বহুল পরিচিত ও আলোচিত আঙ্গরপোতা-দহগ্রাম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। আঙ্গরপোতা-দহগ্রাম বাংলাদেশের একটি ছিটমহল। বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলাস্থ পাটগ্রাম থানার দু'টি ইউনিয়ন আঙ্গরপোতা ও দহগ্রাম নিয়ে গঠিত ছিটমহলটি লালমনিরহাট জেলা হতে প্রায় ৯৮ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে ভারতের কুচবিহার জেলার মেখলীগঞ্জ থানার মধ্যে অবস্থিত। মোট আয়তন ৯.৬১ বর্গ কি.মি. এবং মোট জমির পরিমাণ ৪,৬১৭ একর। জনসংখ্যার পরিমাণ প্রায় ১২,৫০০। জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানরাই সংখ্যাগুরু। বাংলাদেশের পানবাড়ী সীমান্ত ফাঁড়ীর পশ্চিমে বাংলাদেশ এবং আঙ্গরপোতা-দহগ্রাম এর মাঝে ভারতীয় জমি যা তিন বিঘা করিডোর নামে পরিচিত এবং এই তিন বিঘা করিডোরই বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে আঙ্গরপোতা-দহগ্রাম ছিটমহলে যাওয়ার

www.pathagar.com

একমাত্র পথ। আঙ্গরপোতা-দহগ্রাম এবং তিন বিঘা করিডোরের একটি স্কেচ সংযুক্ত হলো।

২। ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পর থেকে আঙ্গরপোতা-দহগ্রাম ছিটমহল বাংলাদেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। উক্ত ছিটমহলটিতে যাতায়াত/যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম তিন বিঘা এলাকাটি ভারতের কর্তৃত্বাধীন থাকায় ছিটমহলের জনগণ বিশেষ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছিল। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার সীমান্ত সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি নির্ধারণ করে ১৯৭৪ সালে উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীগণের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি ১৯৭৪ নামে অধিক পরিচিত।

৩। ১৯৭৪-এ মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি মোতাবেক আঙ্গরপোতা-দহগ্রাম বাংলাদেশের অংশ হিসেবে থাকা এবং এর সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপনে ভারতের কাছ থেকে তিনবিঘা করিডোর চিরস্থায়ীভাবে লিজ পাওয়ার বিনিময়ে দক্ষিণ বেরুবাড়ী ইউনিয়ন এবং সংযুক্ত ছিটমহলসমূহ (দুইটি) ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে অনেকটা এইরকম সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক। "India will retain the southern half of south Berubari Union No. 12 and the adjacent enclaves, measuring an area of 2.64 square miles approximately, and in exchange Bangladesh will retain the Dahagram and Angarpota enclaves. India will lease in perpetuity to Bangladesh an area of 178 metres X 85 metres near 'Tin Bigha' to connect Dahagram with panbari Mouza (P.S Patgram) of Bangladesh".

খ। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে চুক্তিটি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে অনুমোদনের পর দক্ষিণ বেরুবাড়ী এবং সংযুক্ত ছিটমহলটি বাংলাদেশ ভারতকে প্রদান করেন। এলাকাটির আয়তন মোট ৭০০ বর্গমাইল (দক্ষিণ বেরুবাড়ীর অর্ধাংশ-৪.৩৬ বর্গমাইল

www.pathagar.com

এবং সংযুক্ত ছিটমহলটি ২.৬৪ বর্গমাইল)। পক্ষান্তরে ভারত সরকার তিন বিঘা করিডোর হস্তান্তরের ব্যাপারে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, কারণ ভারত কর্তৃক মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি ১৯৭৪ রেটিফাই হয়নি।

গ। আঙ্গরপোতা-দহগ্রামে বাংলাদেশী অধিবাসীদের চরম দুর্ভোগের প্রেক্ষাপটে ১৯৮২ সালের ৭ অক্টোবর তারিখে বাংলাদেশ-ভারত পররাষ্ট্রমন্ত্রী, যথাক্রমে জনাব এ আর এস দোহা ও পি ভি নরসিমা রাও-এর মধ্যে বিনিময়কৃত পত্রের (Exchange of Letter) মাধ্যমে তিন বিঘা করিডোর হস্তান্তরের রূপরেখা নির্দিষ্ট করা হয়, কিন্তু পরবর্তীতে ভারত এর বাস্তবায়নে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

ঘ। ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে তিন বিঘা করিডোর বিষয়ে উভয় দেশের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে স্বাক্ষরিত একটি পত্র বিনিময়ের (Exchange of Letter) মাধ্যমে ছিটমহলবাসীগণের জন্য বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডে যাতায়াতের একটা সাময়িক ব্যবস্থা চালু করা হয় যদিও পত্রের শর্তসমূহ বাংলাদেশের স্বার্থের অনুকূলে ছিল না বলেই বিশ্বাস করা হয়। উক্ত পত্রে উল্লেখিত ব্যবস্থাদির মধ্যে যাতায়াত সম্পর্কিত নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

"উত্তর-দক্ষিণ রাস্তা দিয়ে ভারতীয় যানবাহন ও জনসাধারণের চলাচল পূর্বের ন্যায় চালু থাকবে। বাংলাদেশের যানবাহন ও জনসাধারণের চলাচলের জন্য পূর্ব-পশ্চিম রাস্তা শুধুমাত্র দিনের বেলা এক ঘণ্টা পর পর এক ঘণ্টার জন্য ব্যবহার করবে। কিন্তু জরুরী পরিস্থিতিতে স্থানীয় পর্যায়ে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে, যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের চলাচল ও জরুরী চিকিৎসা।" বহুদিনের কষ্টের সাময়িক অবসান হয় এই ব্যবস্থার মাধ্যমে।

www.pathagar.com

ঙ। চুক্তি অনুযায়ী ২৬ জুন '৯২ হতে প্রতিদিন সকাল সাড়ে সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত প্রতি এক ঘণ্টা অন্তর বাংলাদেশী অধিবাসীদের চলাচলের জন্য করিডোর গেট খোলা হয়।

চ। ২৬ জুন '৯২ তারিখে করিডোর খোলা সংক্রান্ত পত্রের শর্তানুযায়ী করিডোরের উভয় পার্শ্বে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে দু'টি পোস্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু তদানুযায়ী বিডিআর সৈনিকগণ পোস্ট স্থাপনের পদক্ষেপ নিলে বিএসএফ সদস্যগণের ঘোর আপত্তির মুখে তা দীর্ঘদিন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছিল না। পরবর্তীতে প্রচণ্ড বাধা সত্ত্বেও ২৪ নভেম্বর '৯৬ তারিখে করিডোরের দুই পার্শ্বে দু'টি বিডিআর পোস্ট স্থাপন করা হয়।

৪। ১৯৯৬ সালের পরে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হয় যা নিম্নরূপঃ

ক। ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে উভয় দেশের সচিব পর্যায়ে পত্র বিনিময় সম্পর্কিত চুক্তির পর পর ভারত সরকার করিডোরের চতুর্দিকে ১৩টি বিএসএফ ক্যাম্প এবং ১৭টি টাওয়ার নির্মাণ করে যা ছিটমহলবাসীদের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় এবং সর্বক্ষেত্রে বিএসএফ সদস্যদের হস্তক্ষেপ বাংলাদেশের অধিবাসীদের প্রায় জিম্মি করে রেখেছিল। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালের নভেম্বর মাসে মহাপরিচালক-বাংলাদেশ রাইফেলস ছিটমহল পরিদর্শনে গিয়ে ছিটমহলবাসীদের বিশেষ দাবীর প্রেক্ষিতে এবং তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে ছিটমহলের মধ্যে একটি সীমান্ত ফাঁড়ি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে একটি অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করেন। পরবর্তীতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে ২০ মার্চ '৯৭ তারিখ দহগ্রাম সীমান্ত ফাঁড়ি স্থাপিত হয় এবং ২৩ মার্চ '৯৭ তারিখ সীমান্ত ফাঁড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এই সীমান্ত ফাঁড়ি স্থাপনের ফলে ছিটমহলবাসীরা নিজেদেরকে স্বাধীন বাংলাদেশী ভাবার সুযোগ পেয়েছে এবং তাদের নিরাপত্তা এবং স্বার্থ নিশ্চিত হয়েছে। বিওপি-তে উত্তোলিত

www.pathagar.com

বাংলাদেশের পতাকা নিশ্চিত করেছে যে এই ছিটমহল বাংলাদেশের।

খ। বিভিন্ন সময়ে বা তারিখে বিডিআর-বিএসএফ-এর মহাপরিচালক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মহাপরিচালক-বাংলাদেশ রাইফেলস আঙ্গরপোতা-দহগ্রামের সমস্যাসমূহ উত্থাপন করেন বলে জানা যায়। তিনি সময়সূচী অনুযায়ী করিডোর খোলা/বন্ধের ফলে সৃষ্ট অসুবিধা বর্ণনা করে করিডোর বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য ২৪ ঘণ্টার জন্য খোলা রাখার প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

৫। উল্লেখ্য যে, মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি-১৯৭৪ যথাযথভাবে অনুসরন করলে আঙ্গরপোতা-দহগ্রাম সম্পর্কিত নানাবিধ সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব। বাংলাদেশ সরকার এই চুক্তি রেটিফাই করা সত্ত্বেও ভারত সরকার এ চুক্তি এখনো রেটিফাই করেনি। এ চুক্তি ভারত কর্তৃক রেটিফাই করা হলে সীমান্ত সমস্যার সমাধানসহ উভয় দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এই চুক্তি উভয় দেশের মধ্যে একটি অত্যন্ত যুক্তিসম্মত এবং পরস্পরের মধ্যে একটি সম্মানজনক চুক্তি। সুতরাং ভারত সরকার যাতে এ চুক্তি রেটিফাই করে এবং চুক্তির শর্তে আক্ষরিক অর্থ অনুযায়ী তিন বিঘাসহ সকল সীমান্ত সমস্যা সমাধান করা হয়, সে ব্যাপারে অনতিবিলম্বে যথাযথ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

www.pathagar.com

আঙ্গরপোতা-দহগ্রাম এবং তিন বিঘা করিডোরের স্কেচ

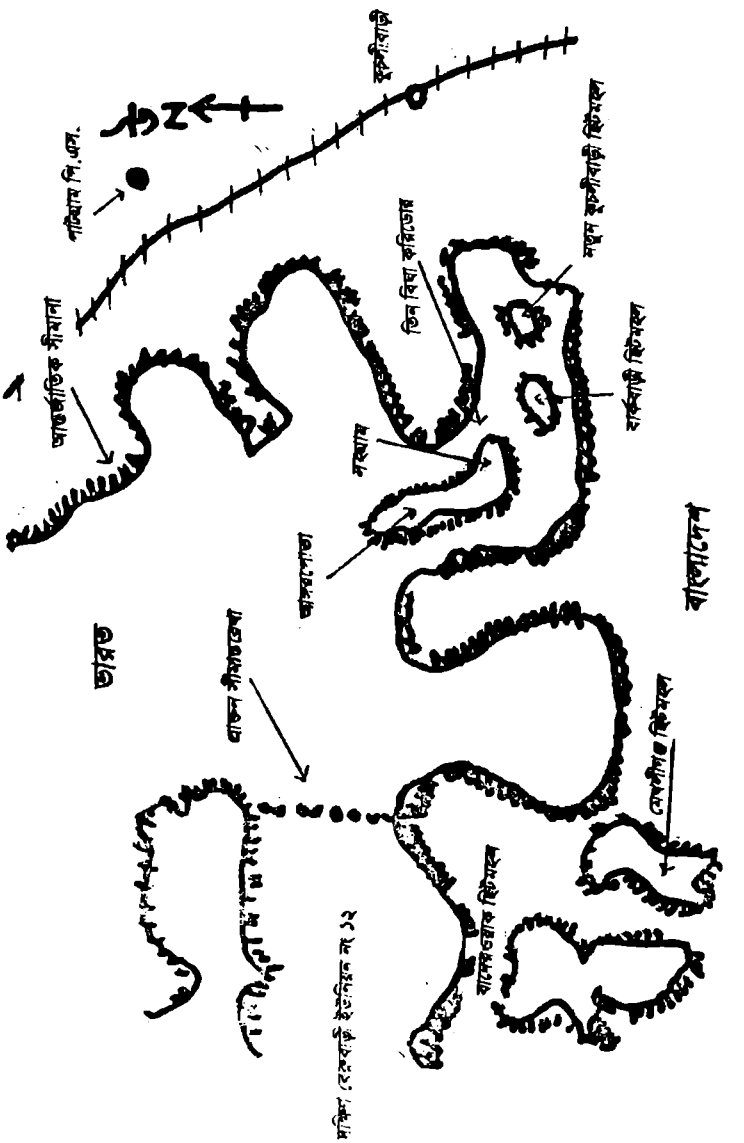

www.pathagar.com

তৃতীয় দলিল

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত কর্তৃপক্ষের জন্য যৌথ নির্দেশাবলী ১৯৭৫

১) ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত আন্তরিক। তখন থেকেই দু'দেশের মধ্যে ছোটখাট কিছু সীমান্ত সমস্যা রয়ে গেছে। যখনই কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে, পারস্পরিক আলোচনা ও সহযোগিতার মাধ্যমে দ্রুততার সাথে এ সব ঘটনার শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছানো হয়েছে। যেহেতু পরস্পরের খুব কাছাকাছি থেকে এই দুই বাহিনী তাদের কর্মতৎপরতা চালায়, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই একটি অভিন্ন সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত দুই বাহিনীর জন্য একটি সুস্পষ্ট এবং যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে, এতে দুই বাহিনীর নিম্নস্তরসমূহের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা রোধ করা সম্ভব হবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবং অপ্রত্যাশিত আন্ত-সীমান্ত কর্মকাণ্ড রোধ করতে ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জন্য একটি নির্দেশাবলী প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ করা হয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ

২) আন্ত-সীমান্ত মূল সমস্যাগুলো হলো :-

ক. সীমান্তের অন্যদিকে জনসাধারণের অননুমোদিত প্রবেশ;

খ. অসাবধানতাবশত যে কোনো দেশের নাগরিকের অপর দেশের স্থল ও নৌ-সীমান্ত অতিক্রম করা;

গ. চোরাচালান;

ঘ. জমি, গবাদিপশু, মৎস্যসম্পদ ইত্যাদির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার দাবী;

ঙ. দাগী আসামীকে ধরতে সীমান্তরক্ষী বাহিনী সীমান্তরেখায় উপস্থিত হলে সংঘর্ষের সম্ভবনা;

চ. অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদের চালান;

ছ. সীমান্ত সংক্রান্ত অপরাধ, বিশেষ করে সশস্ত্র ডাকাতি, গবাদিপশু ধরে নিয়ে যাওয়া, অপহরণ ইত্যাদি।

৩) বিভিন্ন কারণে মাঝে মাঝে সীমান্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে ঃ

www.pathagar.com

ক. অনেক সময় ভূখণ্ডের ঠিক কোন স্থানে আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখা অবস্থিত সেটা না জেনে নিজেদের ভূখণ্ড ভেবে এক দেশের নাগরিক আরেক দেশের সীমানা অতিক্রম করলে;

খ. নদীবাহিত যে এলাকায় দু'দেশের সীমান্তরেখা একে অপরকে ছেদ করার ফলে এক দেশের জমি যখন আরেক দেশের সীমানাভুক্ত হয়, সেই জমিগুলো চাষ করতে গিয়ে কিংবা জমির মালিকানা যথার্থ মালিকের কাছে ফেরত দেয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে;

গ. বন্যার পর যখন কোনো চর জেগে ওঠে, সেটা নদীগর্ভে হোক অথবা মূল ভূখণ্ড সংলগ্ন হোক, উভয় দেশের নাগরিক সেই চর দখল করার জন্য মালিকানা আর পাল্টা মালিকানার দাবী জানানোর চেষ্টা করলে;

ঘ. নদী যখন আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখায় উপনীত হয় তখন অনেক সময় মাছ ধরা এবং নৌ চলাচলে সমস্যা সৃষ্টি হয়;

ঙ. যখন গবাদিপশু ধরে নিয়ে যাওয়া কিংবা যে কোনো এক দেশের স্থানীয় অধিবাসীদের বিনা অনুমতিতে অপর দেশে প্রবেশ রোধ করার চেষ্টা করা হয়;

চ. যৌথ ভূখণ্ডগত সীমান্ত চিহ্নিতকরণের আলোকে স্থানীয় জনগণ যখন 'অপদখলীয় এলাকা'-য় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।

৪) উপরোক্ত সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করে এ সম্পর্কে প্রশাসনকে যত শীঘ্র সম্ভব অবগত করার জন্য দু'দেশের সীমান্ত কর্তৃপক্ষ নিজেদের মধ্যে প্রায়শই নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে। উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, দুই সীমান্তরক্ষী বাহিনী এবং পুলিশ বাহিনীর মধ্যে ঘনিষ্ট সহযোগিতা বিদ্যমান থাকবে এবং আন্ত-সীমান্ত অপরাধ, চোরাচালান ইত্যাদি সমূলে উৎপাটন করতে উভয় দিকের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মধ্যে সময়মতো তথ্য ও সংবাদ আদান-প্রদান করার জন্য সম্ভব সকল কিছু করতে হবে। উভয় পক্ষ এটাও নিশ্চিত করবে যেন মুদ্রা অথবা পণ্যের অবৈধ ব্যবসা, কৃষি পণ্যের মজুদ গড়ে তোলা এবং অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ প্রবেশ রোধ করতে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়। যদি এমন তথ্য পাওয়া যায় যে এক দেশের নাগরিক অপর দেশের অপরাধের সাথে জড়িত, তবে সেই নাগরিকের বিরুদ্ধে ঐ দেশের আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে। যখন এক দেশের নাগরিক নিজের দেশে কোনো অপরাধ সংঘটিত করার পর অপর দেশে পালিয়ে যায় এবং ধরা পড়ে তখন দেশের আইন অনুযায়ী তার

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পর অপর দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কর্মকর্তাদের কাছে তাকে হস্তান্তর করা হবে।

৫) ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অমীমাংসিত সীমান্ত সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান ২৫ মার্চ, ১৯৭১ সালের অবস্থান অনুযায়ী করা হবে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমান্তের কোনো এলাকায় নিজ নিজ দেশের ভূমি নথিভুক্ত ও জরিপ বিভাগের প্রধানের নিয়মমাফিক পরিদর্শনের ক্ষেত্রে তা কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করবে না। সীমানাস্তম্ভ যদি হারিয়ে যায় তবে যত দ্রুত সম্ভব তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে। বিএসএফ এবং বিডিআর যৌথভাবে বছরে একবার (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) সীমানাস্তম্ভগুলো পরিদর্শন করবেন।

৬) উভয় দেশের সীমান্ত এলাকার জেলাগুলোর কর্তৃপক্ষ যত শীঘ্র সম্ভব সকল সীমান্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে পরস্পরের সাথে আলোচনায় বসবে। যে সমস্যার সমাধান স্থানীয় পর্যায়ে করা সম্ভব হচ্ছে না সে সম্পর্কে যত শীঘ্র সম্ভব নিজ নিজ সরকারকে অবগত করতে হবে।

৭) সীমান্তে কোনো সমস্যা হয়েছে এমন খবর পাবার সাথে সাথে বিএসএফ-এর কমান্ড্যান্ট অথবা বিডিআর-এর উইং কমান্ডার আলোচনার জন্য প্রতিপক্ষের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং সেই সমস্যার কার্যকরী নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনে ঐ এলাকায় একটি যৌথ তদন্ত চালাবেন। প্রয়োজনে পরবর্তীতে দুই জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/ডিসি পর্যায়ে বৈঠক হবে।

৮) অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার সম্ভবনা রোধ করার জন্য উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী নিম্নবর্ণিত সাধারণ নিয়মগুলো মেনে চলবে ঃ

ক. এই নির্দেশাবলী মেনে চলার ক্ষেত্রে কিংবা ২৫ মার্চ, ১৯৭১ তারিখ অনুযায়ী ক্রিয়াশীল সীমান্ত মেনে চলার ক্ষেত্রে অথবা যদি কোনো একটি আন্তর্জাতিক সীমান্তস্তম্ভ নিরুদ্দেশ হওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়, তবে আইনসম্মত সীমান্তরেখা ক্ষুণ্ন না করে উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী সহজে চিহ্নিত করা যায় এমন একটি ক্রিয়াশীল সীমান্ত চিহ্নিত করবে;

খ. ক্রিয়াশীল সীমানা আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে এবং এই গ্রহণযোগ্য সীমান্তরেখাকে

www.pathagar.com

আইনসম্মত সীমান্তরেখা হিসেবে দাবী করার ব্যাপারে কোনো পক্ষ নিজ দেশের সরকারের উপর কোনোভাবে চাপ সৃষ্টি করবে না। যখনই প্রয়োজন ক্রিয়াশীল সীমানা সাধারণভাবে চিহ্নিত করা হবে এবং বড় আকৃতির মানচিত্রে যৌথভাবে প্রদর্শন ও সংরক্ষণ করা হবে;

গ. একটি শনাক্তকারী সীমান্তরেখা চিহ্নিত করার পর, সেটা 'প্রকৃত' অথবা 'ক্রিয়াশীল' যে হিসাবেই চিহ্নিত করা হোক, এই রেখার উভয় দিকের ১৫০ গজের মধ্যে কোনো পক্ষের কোনো স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী সীমান্তরক্ষী বাহিনী কিংবা কোনো সশস্ত্র ব্যক্তি থাকবে না। চূড়ান্ত সীমান্ত চিহ্নিতকরণের আগ পর্যন্ত এবং সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কোনো স্থায়ী পোস্ট নির্মাণ করা যাবে না;

ঘ. এই ব্যবস্থা কোনো পক্ষকে 'প্রকৃত' কিংবা 'ক্রিয়াশীল' কোনো সীমানায় টহল দেয়া থেকে বিরত রাখবে না যদি না-

১. যখন অপর পক্ষকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সতর্ক সংকেত দেয়া হয়েছে;

২. টহলদারের সংখ্যা হবে অল্প সংখ্যক, অর্থাৎ দশের বেশী নয় (১ থেকে ১০-এর মধ্যে);

ঙ. ৩০০ গজের মধ্যে (সীমান্তের উভয় দিকে ১৫০ গজ হিসেবে) যদি ট্রেঞ্চ খোঁড়াসহ কোনো প্রকারের আত্মরক্ষামূলক কোনো ব্যবস্থা কেউ নেয়, তবে এগুলোকে ধ্বংস করা হবে অথবা ভরাট করে ফেলা হবে;

চ. ৩০০ গজের মধ্যে (সীমান্তের উভয় দিকে ১৫০ গজ হিসেবে) কোনো বেসামরিক সশস্ত্র ব্যক্তি যাতে প্রবেশ করতে না পারে তা রোধ করার দায়িত্ব উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর;

ছ. নিজ নিজ এলাকায় চোরাচালানী বন্ধ করার দায়িত্ব দু'দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উপর ন্যস্ত। সুতরাং, চোরাচালানে নিয়োজিত যে কোনো দেশের নাগরিককে গ্রেফতার করা, অস্ত্রসহ বা নিরস্ত্র যাই হোক না কেন, এবং দেশের আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে;

জ. 'প্রকৃত' অথবা 'ক্রিয়াশীল' সীমানা যদি নদীর মাঝপ্রবাহ দিয়ে যায় তবে উভয় পক্ষই নদীর মূল গতিপথ ব্যবহার করার

www.pathagar.com

সুযোগ পাবে। নিয়মিত প্রহরা এবং কোনো দেশের নাগরিক যাতে হয়রানির স্বীকার না হয় সে জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরন করা হবে :-

১. যদি সম্ভব হয় তবে নদীর তীরে কিংবা মূল গতিপথে যেখানে নদীর মাঝপ্রবাহ শেষ হয়েছে অথবা শুরু হয়েছে সেখানে একটি যৌথ চেকপোস্ট তৈরী করা হবে;

২. যৌথ চেকপোস্টে পরিদর্শনের জন্য পণ্যের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হবে। এই তালিকা চেকপোস্ট অনুমোদন করার পরে এই পণ্যগুলোকে নৌ-পথে পরিবহনের জন্য শুধুমাত্র নদীর মূল গতিপথ ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হবে;

৩. অন্য দেশের মূল পথ ব্যবহার করছে এমন কোনো নৌযানকে নদীর তীরে ঘেঁষতে দেয়া হবে না কিংবা অপর দেশের নাগরিকের কাছে কোনো পণ্য হস্তান্তর কিংবা কোনো ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে দেয়া হবে না;

ঝ. সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণের মধ্যে কোনো ধরনের গোলমালের সূত্রপাত হলে উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী কোনোভাবেই এতে অংশ নেবে না। যদি কোনো দেশের নাগরিক অপর দেশের ক্রিয়াশীল সীমান্ত অতিক্রম করে অবৈধভাবে প্রবেশ করে এবং কোনো ধরনের আক্রমণ চালায় বা চালানোর চেষ্টা করে, তবে সীমান্তরক্ষী বাহিনী 'আত্মরক্ষার খাতিরে' সম্ভব হলে গুলিবর্ষণ ছাড়া অন্য যে কোনো ধরনের ব্যবস্থা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে নেয়ার অধিকার রাখে। যদি গুলিবর্ষণ করতে হয়, তবে স্থানীয় কমান্ডার তার প্রতিপক্ষকে এবং নিজের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করবে;

ঞ অসাবধানতাবসত সীমান্ত অতিক্রম করার ঘটনা ঘটলে, ঘটনাটি অসাবধানতাবসত ঘটেছে এ সম্পর্কে নিজেরা সন্তুষ্ট হবার পর সীমান্তরক্ষী বাহিনী ঐ ব্যক্তিকে কর্মকর্তা পর্যায়ে অপর পক্ষের কমান্ডারের কাছে যত শীঘ্র সম্ভব হস্তান্তর করবেন;

www.pathagar.com

ট. জরিপকারী দল, বনরক্ষী প্রভৃতি সরকার নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ আন্তর্জাতিক সীমানার কাছে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। সীমান্তরক্ষী বাহিনী তাদের কাজে হস্তক্ষেপ না করে বরং তাদের সহায়তা করবে। এ ধরনের দলের উপস্থিতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিভাগের পক্ষ থেকে উভয় পক্ষকে লিখিতভাবে জানাতে হবে;

ঠ. সীমান্ত এলাকায় রাখালবিহীন অবস্থায় গবাদিপশু চড়ানো নিরুৎসাহিত করা হবে। যদি কোনো দেশের গবাদিপশু অপর দেশের সীমানায় প্রবেশ করে, তবে পশুটি সত্যি সত্যি সীমান্ত অতিক্রম করে এসেছে সেটা নিশ্চিত হবার পর পশুটিকে বিওপি কমান্ডার তার প্রতিপক্ষের কাছে হস্তান্তর করবেন এবং একটি প্রাপ্তিস্বীকার পত্র গ্রহণ করবেন। পোস্ট কমান্ডার এ ধরনের ঘটনার যথাযথ তথ্য সংগ্রহে রাখবেন;

ড. সীমান্ত এলাকা থেকে গবাদিপশু ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এমন কোনো খবর পাওয়া গেলে অপর পক্ষের পোস্ট কমান্ডারের কাছে পশুটির গমনপথ এবং এর সাথে জড়িত অপরাধীদের একটি তালিকা প্রভৃতিসহ একটি প্রতিবেদন হস্তান্তর করবেন। বিওপি কমান্ডার এই প্রতিবেদনের প্রাপ্তি স্বীকার করবেন এবং নিজ দেশের নিকটতম পুলিশ স্টেশনে বিষয়টি অবগত করবেন এবং তারা পশুটিকে উদ্ধার এবং অপরাধীদের ধরতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন। উদ্ধার করার পর পশুটিকে অবগত পোস্ট কমান্ডারের কাছে হস্তান্তর করা হবে এবং তিনি প্রাপ্তিস্বীকার পত্রের ভিত্তিতে প্রতিপক্ষের কাছে হস্তান্তর করবেন। সেই দেশের সরকারের অনুমতি ছাড়া এর জন্য কোনো অর্থ আদায় করা যাবে না;

৯) উপরোক্ত বিষয়গুলোকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য উভয় দেশের সীমান্ত কয়েকটি সেক্টর/সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হবে। সেক্টর/সাব-সেক্টরগুলোর অবস্থান এবং এদের প্রধান কার্যালয়ের অবস্থানসমূহ অপর পক্ষের কাছে প্রকাশ করতে হবে এবং উভয় দেশের প্রধান কার্যালয়ের মধ্যে টেলিফোনে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা নেয়া হবে;

www.pathagar.com

১০) সাব-সেক্টর কমান্ডারের পদমর্যাদা হবে ক্যাপ্টেন/মেজর পর্যায়ের কিংবা পুলিশ বিভাগের সমপর্যায়ের মর্যাদাসম্পন্ন;

১১) নিজ নিজ এলাকায় সেক্টর/সাব-সেক্টর/পোস্ট কমান্ডারের দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ :-

১. অপর পক্ষের সমপর্যায়ের কর্মকর্তার সাথে তারা ঘনিষ্ট যোগাযোগ রাখা;

২. নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে তারা নিজ এলাকার স্থানীয় জনসাধারণের সাথে এবং অপর পক্ষের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সাথে পরিচিত হওয়া;

৩. সীমান্ত সংক্রান্ত যেমন জমির মালিকানা, স্থাবর সম্পত্তি যা সীমান্তের অপর দিকে রয়েছে, চরের জমি, নৌ চলাচলের সুবিধা এবং চাষাবাদ সংক্রান্ত কোনো ধরনের সমস্যা দেখা দিলে এ সম্পর্কে সকল অভিযোগ গ্রহণ করা। তথ্য প্রতিবেদন পাবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তারা একটি যৌথ তদন্ত চালানো;

৪. যত দ্রুত সম্ভব নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করা, যেমন যদি এক দেশের নাগরিক নতুন করে জমির মালিকানার দাবী জানিয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয় যা নিয়ে অপর পক্ষের আপত্তি রয়েছে, তবে দুই কমান্ডার একত্রিত হয়ে ঐ এলাকায় একটি যৌথ তদন্ত চালানো এবং যথাযথ পর্যায়ে বিষয়টির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ঐ ব্যক্তিকে নিজের দাবী প্রতিষ্ঠা থেকে বিরত রাখা;

৫. যথাযথ কর্তৃপক্ষেকে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করার দায়িত্ব দুই কমান্ডারের এবং বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ কাজ করছেন কিনা তা লক্ষ্য রাখার দায়িত্বও এদের;

১২. দুই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে ফলপ্রসু সম্পর্ক স্থাপন এবং উভয় পক্ষের কার্যক্রম সম্পর্কে বিভ্রান্তি দূর করতে সাহায্য করার জন্য প্রত্যেকটি পর্যায়ে যোগাযোগ রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ;

www.pathagar.com

যোগাযোগ

১৩. দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রাখার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যাপ্ত যোগাযোগ বজায় রাখা জরুরী;

১৪. বাংলাদেশ রাইফেলস্-এর ডাইরেক্টর জেনারেল এবং কলকাতা/শিলং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স-এর ইন্সপেক্টর জেনারেল একে অপরের সাথে প্রয়োজনে যোগাযোগ করবেন। দুই দেশের কোম্পানী/উইং হেডকোয়ার্টার এবং উভয় দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিওপিগুলোর মধ্যে যত দ্রুত সম্ভব যোগাযোগ স্থাপন করা হবে। প্রয়োজনে বেসামরিক টেলিফোনে যোগাযোগ করা হবে;

১৫. পতাকার মাধ্যমে যোগাযোগঃ- টেলিফোনে যোগাযোগ করার সুযোগ নেই অথচ এক পক্ষের কমান্ডার অপর পক্ষের কমান্ডারের সাথে যোগাযোগ করতে চাইছেন, সেক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পতাকা উত্তোলন করে প্রহরা ছাড়াই নিরস্ত্র অবস্থায় আগে থেকে নির্ধারিত করে রাখা সীমান্তবর্তী কোনো এলাকার দিকে এগিয়ে যাবেন। অপর পক্ষের উপস্থিত কমান্ডার অথবা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উত্তোলিত পতাকা দেখার পর সংকেত জানিয়ে এর উত্তর দেবেন এবং নিজেও প্রহরা ছাড়া নিরস্ত্র অবস্থায় সেই এলাকার দিকে এগিয়ে যাবেন;

১৬. যেখানে পোস্টের অবস্থান সীমান্ত থেকে বেশ দূরে অবস্থিত এবং দৃষ্টিসীমার বাইরে, সেখানে একজন বার্তাবাহকের মাধ্যমে অপর পক্ষের কাছে বৈঠকের খবর পৌছালে অপর পক্ষ বৈঠকের জন্য সীমান্তে উপস্থিত হবেন;

১৭. উভয় পক্ষের সীমান্ত খুঁটি এবং পর্যবেক্ষণ শিবিরের জন্য নিম্নবর্ণিত রঙের পতাকা উত্তোলন করবে :-

খুঁটি		**পর্যবেক্ষণ শিবির**	
উচ্চতা	কাপড়	উচ্চতা	কাপড়
৭ ফুট	৪ X ৩ ফুট	৩ ফুট	২ X ২ ফুট

পতাকার রং : ভারত - **কমলা**
বাংলাদেশ - **নীল**

www.pathagar.com

১৮. উভয় কমান্ডারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাতের বেলা পতাকার বদলে আলোর মাধ্যমে (দু'টি সংকেতসূচক লাল আলো) অথবা টর্চ জ্বালিয়ে সংকেত দেয়া হবে;

১৯. উভয় পক্ষের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/ডিসি যদি কোনো যৌথ তদন্ত চালান তবে প্রয়োজনে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এবং পুলিশের স্থানীয় কর্মকর্তা ঐ বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।

চতুর্থ দলিল

ভারতের সাথে সীমান্ত চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত কিছু তথ্য

ভারতের প্রদেশসমূহের নাম	ভূ-খণ্ড (কি.মি.)	এলাকার তারতম্য (কি.মি.)	মোট দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
পশ্চিমবঙ্গ	২১১২	১৫০	২২৬২
আসাম	২৩৪	৩০	২৬৪
মেঘালয়	৪৩৬	-	৪৩৬
ত্রিপুরা	৮৭৪	-	৮৭৪
মিজোরাম	৩২০	-	৩২০
মোট	**৩৯৭৬**	**১৮০**	**৪১৫০**

বিডিআর-এর সদরদপ্তর পিলখানা, ঢাকা থেকে নিয়ন্ত্রিত বিডিআর সেক্টরসমূহ :

১. খুলনা	২. কুষ্টিয়া	৩. রাজশাহী	৪. দিনাজপুর
৫. রংপুর	৬. ময়মনসিংহ	৭. সিলেট	৮. কুমিল্লা
৯. খাগড়াছড়ি	১০. রাঙ্গামাটি	১১. চট্টগ্রাম	

বিএসএফ-এর সদরদপ্তর দিল্লীতে অবস্থিত। ২/৩টি সেক্টর নিয়ে একেকটি ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টার গঠন করে মোট ৪টি ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টার বাংলাদেশের সাথে সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। প্রত্যেকটি ফ্রন্টিয়ারের প্রধান একজন আইজি এবং প্রত্যেক সেক্টরের প্রধান একজন ডিআইজি। ৪টি ফ্রন্টিয়ারের অধীনে সেক্টরসমূহ হলো :

১. দক্ষিণ ফ্রন্টিয়ার : প্রধান কার্যালয় - কলকাতা

www.pathagar.com

সেক্টরসমূহ : ১. কলকাতা ২. কৃষ্ণনগর ৩. মালদহ

২. উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার : প্রধান কার্যালয় - শিলিগুড়ি
সেক্টরসমূহ : ১. কিষাণগড় ২. শিলিগুড়ি ৩. কুচবিহার

৩. আসাম-মনিপুর-মেঘালয়-নাগাল্যাণ্ড ফ্রন্টিয়ার : প্রধান কার্যালয় - শিলং
সেক্টরসমূহ : ১. গোহাটি ২. শিলং

৪. ত্রিপুরা-কাছার-মিজোরাম ফ্রন্টিয়ার : প্রধান কার্যালয় - আগরতলা
সেক্টরসমূহ : ১. কাছার ও মিজোরাম ২. ত্রিপুরা উত্তর ৩. ত্রিপুরা দক্ষিণ

সীমান্ত পর্যবেক্ষণ শিবির বা বর্ডার অবজারভেশন পোস্টের (বিওপি) সংখ্যা

ভারতীয় সীমানায় বাংলাদেশের স্থায়ী বিওপি ৪৮৯টি
ভারতীয় সীমানায় বাংলাদেশের অস্থায়ী বিওপি ০১টি
বাংলাদেশের সীমানায় ভারতীয় স্থায়ী বিওপি ৬৮২টি

বাংলাদেশ সীমান্তের দৈর্ঘ্য

ভারতের সাথে

ভারতের সাথে স্থায়ী সীমান্ত দৈর্ঘ্য : ৩৯৭৬ কিমি
ভারতের সাথে অস্থায়ী সীমান্ত দৈর্ঘ্য : ১৮০ কিমি
মোট - ৪১৫০ কিমি

মায়ানমারের সাথে

মায়ানমারের সাথে স্থায়ী সীমান্ত দৈর্ঘ্য : ২০৮ কিমি
মায়ানমারের সাথে অস্থায়ী সীমান্ত দৈর্ঘ্য : ৬৩ কিমি
মোট ২৭১ কিমি

www.pathagar.com

আলোচকবৃন্দের আলোচনার সারমর্ম

তারকা (*) চিহ্নিত ব্যক্তিবর্গ আলোচনাপর্বে তাদের বক্তব্য রেখেছিলেন ইংরেজিতে, যা এই পুস্তিকার প্রয়োজনে বাংলায় ভাবানুবাদ করা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত মারাত্মক কোনো ভুলের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী।

মেজর জেনারেল (অবঃ) এজাজ আহমেদ চৌধুরী, পিএসসি

তিন দিক থেকে বাংলাদেশের সাথে ভারতের যে সীমানা রয়েছে তার দৈর্ঘ্য ৪১৫৬ কি.মি.। এর ৬.৫ কি.মি. ছাড়া বাকী অংশ চিহ্নিত করা হয়েছে। যে সব এলাকা নিয়ে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে এখনও সমস্যা বিদ্যমান সেগুলো অনির্ধারিত সীমানাভুক্ত, অপদখলীয় এলাকা অথবা ছিটমহল হিসেবে রয়েছে। বিডিআর-এর একজন প্রাক্তন মহাপরিচালক হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা হলো, বিডিআর বিভিন্ন সময়ে সীমান্ত সংক্রান্ত অমীমাংসিত সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য বৈঠকগুলোতে বারবার তাগিদ দিলেও অপর পক্ষ থেকে তেমন কোনো উৎসাহ দেখা যায়নি। যৌথ নদী কমিশনও বারবার চেষ্টা চালিয়ে অপর পক্ষের কাছ থেকে সহযোগিতার অভাবের কারণে খুব বেশী দূর এগুতে পারেনি। ভারতের ধীরে চলা নীতি আমাদের দেশের জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সব সময়ই হুমকি হয়ে থাকছে। বছরের পর বছর ধরে চলা সীমান্ত সংঘর্ষেরই একটি নমুনা পাদুয়া ও রৌমারীর ঘটনা। সীমান্ত সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার পাশাপাশি ৩টি সমস্যা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, সেগুলো হলো-

১) সিলেটের উত্তর সীমানায় ডাউকী সীমান্তে সাংগ্রাম বিওপি-এর উল্টোদিকে ১৯৭৩ সালে ভারত কর্তৃক নির্মিত ৮০´X ৮০´-এর একটি বাঁধ যা বাংলাদেশের সীমানার ভিতরে ঢুকে পড়েছে।

২) সিলেটের জকিগঞ্জের উল্টোদিকে করিমগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর উপর ভারত একটি জেটি নির্মাণ করেছে, যেখানে সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে কুশিয়ারা নদীর মাঝপ্রবাহ বরাবর। ফলে বর্ষাকালে আমাদের এলাকাগুলো বন্যার পানিতে ডুবে যায়।

৩) খোয়াই নদীর অপর পার্শ্বে হবিগঞ্জের কাছে বল্লা নামের ৮০ একর বিশিষ্ট একটি স্থান ভারত দখল করে সেখানে একটি বাঁধ নির্মাণ করায় বাংলাদেশ অংশের নদীতে চর জেগে উঠছে, এই চর ভারত নিজের সীমানা বলে দাবী করছে। এই সমস্যার আংশিক সমাধান হলেও উত্তেজনা রয়েই গেছে।

www.pathagar.com

অন্যান্য সমস্যার মধ্যে তামাবিল, বেনাপোল, সাতমসজিদ এবং বাংলাবান্ধা - এই ৪টি স্থল বন্দর ছাড়িয়ে আরো ভিতরে বিনা অনুমতিতে ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং তাদের যানবাহনের অবাধ যাতায়াত, এবং ক্ষেত্রবিশেষে রাত্রিযাপন, ঘরবাড়িতে আগুন দেয়া এবং গবাদি পশু ধরে নিয়ে যাওয়া, বাংলাদেশীদের বিনা কারণে হত্যা করা, চোরাচালান ইত্যাদি সমস্যাতো রয়েছেই।

জনাব আবু সাঈদ খান

আমি ১৮ থেকে ২৫ এপ্রিল তারিখের মধ্যে *The Indian Express* এবং *The Hindu* পত্রিকার ওয়েবসাইট থেকে কিছু নিবন্ধ ডাউনলোড করেছি। *The Indian Express*-এর রিপোর্টিংয়ের হেডলাইনগুলো হলো — *Lone survivor's story of three days in killing fields* by Gaurav C Sawant, Kakripara, April 21; *Firing over, it's now time for shooting in the dark* by Express News Service, New Delhi, April 21; *Regrettable and painful, says contrite Bangladesh* by Sonia Trikha, New Delhi, April 21; *Delhi blasts BDR; Dhaka says sorry* by Ajay Suri, New Delhi, April 22; *Indo-Bangla border clash: a major intelligence failure,* New Delhi, April 22; *Eight BSF men shot dead at point blank range*, New Delhi, April 22; *Bordering on danger*, an article by J N Dixit, April 23. *The Hindu*-এর রিপোর্টিংয়ের হেডলাইনগুলো হলো — *16 BSF men killed as BDR opens fire, Haroon Habib reports from Dhaka, Bangladesh action unwarranted: India* by Special Correspondent, New Delhi, April 18; *India lodges protest with Bangladesh* by Special Correspondent, *Last rites performed*, reported by UNI, *Govt. must explain, says CPI(M)* by Javed M. Ansari, *VHP wants apology* by Vinay Kumar, New Delhi, April 21; *Sheikh Hasina calls up Vajpayee, expresses regret over incident* by C. Raja Mohan, Bangladesh, April 23; *A brutal act, says India* by Special Correspondent, New Delhi, April 22, *'Unilateral action', Report awaited, BSF men might*

www.pathagar.com

have strayed by mistake, Mankachar (Assam), April 22; *Jaswant hopes Dhaka will act against killers* by Special Correspondent, New Delhi, April 23; *BDR attack repulsed*, Agartala, April 24; *'BSF entered Baraibari to neutralise firing'* by Vinay Kumar, New Delhi, April 25; *BSF HQ near Bangla border soon: Swami*, Shillong, April 25. আমি এই রিপোর্টগুলোর কিছু কৌশলগত দিক আপনাদের অবগতির জন্য আলোচনাকালে হাইলাইট করেছি। কারণ, ঘটনা ঘটার পর প্রথম সপ্তাহটি সংবাদ পরিবেশনের দিক থেকে আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। একজন বিএসএফ জওয়ানের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে *The Indian Express*-এর সাংবাদিকের লেখা 'Lone survivor's story of three days in killing fields.', এ বর্ণনা মতে সাংবাদিক দেখেছেন যে তার বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আমি সামরিক বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত না, কিন্তু বিএসএফ কখনও কোথাও বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরেছে আমার জানা নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেদিন রাত্রে তাহলে কারা বাংলাদেশ আক্রমণ করল? তবে কি আক্রমণকারীরা ভারতীয় কমাণ্ডো বাহিনীর একটি অংশ? এটা হচ্ছে একটা বিষয়। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, পরস্পরবিরোধী সংবাদ। ২৩ এপ্রিল ২০০১-এর *The Hindu*-এ বিএসএফ-এর ডিআইজি মি. আই জে সিং বললেন যে, প্রায় ৫০০ গ্রামবাসী বিএসএফ-এর টহলদারী দলকে আক্রমণ করেছিল। আর ২৬ এপ্রিল বিএসএফ-এর ডিজি মি. গুরবচন জগৎ বলছেন যে, এদের উপর আক্রমণকারীর সংখ্যা হলো ১০০০। তিন দিনের মাথায় কিন্তু তথাকথিত আক্রমণকারীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেল। কথায় বলে 'Truth is the first casualty of war.' কিভাবে হয় সেটাই এখানে দেখানো হয়েছে। ২২ এপ্রিলের *Indian Express*-এ মন্তব্য করা হচ্ছে বিডিআর-এর ডিজি জে. ফজলুর রহমানের চাকরী চলে যাওয়া উচিত। এই হলো ভারতের গণমাধ্যম এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর আচরণের ধরন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার মহোদয় জেনারেল ফজলুর রহমান সম্পর্কে বলছেন, "I'm not saying he is innocent, but what's the point of getting rid of Fazlur Rehman; all that'll happen is that another non-Fazlur Rehman will take his place. The cause of the conflict must be removed." আমি বুঝতে পারছি না এখানে ফজলুর রহমান সাহেবের ভূমিকাটা কি। অত্যন্ত স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব মি. জে.এন. দীক্ষিত *Indian Express*–এ ২৩ এপ্রিল

www.pathagar.com

একটা নিবন্ধে অত্যন্ত আপত্তিকর ও অপমানজনক কিছু কথা উচ্চারণ করেছেন এবং আমার মনে হয় এ ধরনের বাচনভঙ্গীর প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। তার বক্তব্য হচ্ছে, "Major General Fazlur Rehman, claimed that he has retrieved the territory which rightly belonged to Bangladesh. Rehman, himself, merits comment. He belongs to that category of Bangladeshi Military Officers who were not committed to that country's liberation from Pakistan. He has links with extremist islamic political parties and has acquired somewhat assertive military reputation for having preventing the Myanmar authorities from building a dam over a river on the Bangladesh-Myanmar border." *The Indian Express* বলছে যে, ভারত নিজেই বুঝতে পারছে না আসলে ব্যাপারটা কি ঘটে গেল। তাদের বক্তব্য হলো — ডিজিএফআই, এনএসআইসহ বাংলাদেশের যে সমস্ত গোয়েন্দা সংস্থা আছে, এগুলো সবই মূলত পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর অফিসারদের দিয়ে চলছে। এই কথাগুলো বলছেন ভারতের ইন্টালিজেন্স ব্যুরো-এর প্রাক্তন প্রধান মি. অরুন ভগৎ। আমাদের ঢাকার পররাষ্ট্র সচিবকে উদ্ধৃত করে ভারতের ইউনিয়ন হোম সেক্রেটারী মি. পাণ্ডে বলছেন যে, বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে পররাষ্ট্র সচিব তার অজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেছেন যে বাংলাদেশ সরকার এই বর্ডারের ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানতো না এবং বাংলাদেশ সরকারকে কোণঠাসা করার একটা প্রচেষ্টা এখানে চালানো হয়েছে। *The Hindu*-তে বলা হয়েছে সেই একই ব্যাপার, 'Quoting the Bangladesh Foreign Secretary, Syed Moazzem Ali, as reported in a newspaper interview here, Mr. Pande said, Mr. Ali must have spoken with "responsibility" and that he (Mr. Pande) had no occasion to doubt Mr. Ali's claim of his government's innocence.' এখানে দোষী-নির্দোষের কোনো প্রশ্ন নেই, অথচ ভারতের গণমাধ্যম সে ব্যাপারটাকে খুব জটিল উপায়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে। আমার সৌভাগ্য হয়নি BBC'র 'Question Time India' দেখার, কিন্তু Star News-এর 'Knock-out' অনুষ্ঠানটি আমি দেখেছি, সেই অনুষ্ঠানে পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত মি. পার্থসারথী একটা কথা বার বার বলছিলেন যে, "We have a long hand and we have a formidable presence in Dhaka and India should not hesitate using its

www.pathagar.com

long hand." ভারতের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর পক্ষ থেকে আরেকটা বিষয় উত্থাপিত হয়েছে যে 'ঢাকার উপরে বোমা ফেলা হবে কিনা?' এই বিষয়টি নিয়ে 'Knock-out' অনুষ্ঠানের উপস্থাপক কংগ্রেস-এর মিঃ নটবর সিং-এর মন্তব্য জানতে চাইলে তিনি মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান, বলেন, "I do not want to discuss this issue."

জনাব ফেরদৌস আহমদ কোরেশী

এটা খুবই স্বাভাবিক যে, বাংলাদেশের সীমান্তে এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটার পর বাংলাদেশের পত্রপত্রিকা সেটাকে খুবই ফলাওভাবে প্রকাশ করবে এবং সেটাই হয়েছে। বস্তুত গত ১৭ই এপ্রিল পাদুয়ায় এবং ১৮ই এপ্রিল রৌমারীতে ঘটে যাওয়া ঘটনার পর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের গণমাধ্যমে এই সীমান্ত সম্পর্কিত সংবাদ প্রায়ই প্রতিদিনই শিরোনামে থেকেছে। পত্রিকাগুলোতে এই সংবাদ পরিবেশনের ধরন সম্পর্কে আমি কিছু মন্তব্য করবো। আমাদের পত্রপত্রিকাগুলোতে এই সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটা হচ্ছে যে, কিছু পত্রিকা বিষয়টিকে চাঞ্চল্যকর খবর হিসেবে পরিবেশন করে একটা নাটকীয় পরিবেশ তৈরীর চেষ্টা করেছে। আরেক ধরনের পত্রিকায় একটা আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে খবর পরিবেশন করা হয়েছে, যেখানে বাংলাদেশের জনগণের জঙ্গী মনোভাব পত্রিকার রিপোর্টের ভাষাতেও প্রতিফলিত হয়েছে। এরই পাশাপাশি আমরা দেখছি, কিছু পত্রিকা ভারত-বাংলাদেশ বন্ধুত্বের উপরে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এটা দিতে গিয়ে কোনো কোনো পত্রিকা এবং কিছু কিছু ভাষ্যকার অনেকটা ভারত বা ভারতের গণমাধ্যমের প্রতিক্রিয়ারই প্রতিধ্বনি করেছেন। কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন যে পাদুয়া এবং রৌমারীর ঘটনা কোনো একটা অদৃশ্য শক্তি ঘটিয়েছে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে, বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্ক নষ্ট করার জন্যও সেটা হতে পারে, নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার উদ্দেশ্যে দু'দেশের সরকারও আপোষে এটা করতে পারে। অনেকে বলেছেন, যারা '৭১-এ পাকিস্তানের পক্ষে ছিল, তারাই প্রকারান্তরে পেছনে থেকে অদৃশ্য সুতার টানে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। এই বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া থেকে সাধারণ পাঠক যেটা বোঝার সেটা বুঝে নিয়েছেন। একটি পত্রিকায় এক পৃষ্ঠাব্যাপী পাঠক-পাঠিকাদের মন্তব্য ছাপা হয়েছে। তাদের প্রতিক্রিয়া আমার কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে। যেমন একজন পাঠক বলেছেন,"ভারতকে ক্ষমা চাইতে হবে।" বিভিন্ন লেখকরাও বলেছেন যে এটার দায়-দায়িত্বটা

www.pathagar.com

ভারতের। ঘটনা পরম্পরা যেভাবে এসেছে সেভাবে ভারতেরই দুঃখ প্রকাশ করা উচিৎ ছিল। সেখানে আমরা দুঃখ প্রকাশ করে বসে আছি। একজন পাঠিকা লিখেছেন,"আনন্দে চোখে পানি এসেছে।" এটা কিন্তু একটা সাধারণ মানুষের, দেশের সাধারণ নর-নারীর প্রতিক্রিয়ার একটা প্রতিফলন। আবার পত্রপত্রিকায় 'বিডিআর বাংলাদেশের অতন্দ্র প্রহরী' এবং বিডিআরকে 'সাবাস বিডিআর' বলা – এ ধরনের সংবাদও পরিবেশিত হয়েছে। আরেকটা প্রতিক্রিয়া এসেছে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নিয়ে যা আমাদের জন্য লজ্জার। এই ঘটনায় বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী হিসেবে যারা পরিচিতি তাদের প্রতিক্রিয়া কিন্তু খুব বেশী পত্রপত্রিকায় আসেনি এবং তারা অন্যান্য ক্ষেত্রে যেভাবে মিছিল করে নেমে আসেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে বিবৃতি দেন, এ ব্যাপারে কিন্তু তাদের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অতি সাধারণ পাঠক, পত্রিকায় লিখেছেন, "'নপুংসক' বুদ্ধিজীবীদের জন্য লজ্জা হয়।" আবার আরেকটি প্রতিক্রিয়া দেখেছি 'সরকারের ভূমিকা' সংক্রান্ত। আমাদের সরকার বরাবরই সীমান্ত-সেনাবাহিনী-বিডিআর – এ সব ব্যাপারে স্বচ্ছতা থেকে বহু দূরে। এবারেও দেখা গেল যে, সরকারের বক্তব্যের মধ্যে অস্পষ্টতা ছিল এবং পাঠকরা অনেক পত্রিকায় চিঠিতে লিখেছেন যে, সরকারের ভূমিকায় স্বচ্ছতা দরকার। অনেকে মত প্রকাশ করেছেন যে, এটা দুই সরকারের পাতানো খেলা, এবং সেটার যুক্তি হিসেবে বলা হচ্ছে যে, প্রথমে বলা হলো এটা বিডিআর করেছে, এটা আমাদের সরকার উচ্চ পর্যায়ে জানতো না। পরে বিভিন্ন পত্রিকায় রিপোর্ট দেখছি যে, বিডিআর-এর এই অভিযানের বিষয়টি আমাদের সরকারের উর্ধ্বতন মহলের অগোচরে ছিল না। রৌমারীর ঘটনার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ভারতের রাজনৈতিক মহল, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যরা বলতে চেয়েছিলেন যে এটা একান্তভাবেই একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা যেটা সীমান্তে সীমান্ত রক্ষীদের মধ্যে ঘটে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে এটা ভারতের পত্রিকায় এসেছে এবং বাংলাদেশের পত্রিকায়ও সেটা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে যে, ভারতের বিএসএফ-এর প্রধান রৌমারীর ঘটনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এক্ষেত্রেও পাঠকরা দেখা যাচ্ছে অনেক সচেতন। আরেকজন পাঠক লিখেছেন, "বিডিআর বিশ্বের ছোট ছোট দেশগুলির জন্য নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।" এই মন্তব্যটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় এই জন্য যে, ছোট দেশ হলেই সবকিছু মেনে নিতে হবে এবং কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না, মোকাবেলা করা যাবে না, এ ধরনের একটা ধারণা চালু রয়েছে। সেক্ষেত্রে বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতের পাশে বাংলাদেশ সীমান্তের এই ঘটনা যে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সেটাকে সেভাবে দেখেছে। আরেকটা বিষয় পত্র-পত্রিকায় এসেছে যে, বিডিআর-এর যারা

www.pathagar.com

নিহত হয়েছেন তাদেরকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব দেয়া হোক। এটা আমাদের রাজনৈতিক মহলে, পত্রিকায় পাঠকদের চিঠিতে, সরকারী এবং বিরোধী উভয় দলের বক্তব্যে এখন আসছে। কেউ হয়তো আগে বলছেন, কেউ পরে বলছেন। একটা প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছি, বাংলাদেশের পত্রপত্রিকা এই সীমান্তের ব্যাপারে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। পাদুয়া-রৌমারীর ঘটনা ছাড়াও নীলফামারী-পঞ্চগড়-ফেনী-মুহুরীরচর-সিলেট-জকিগঞ্জ-হিলি-লালমনিরহাট ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যমান সীমান্ত সমস্যা এবং পরবর্তীতে সীমান্তে যে সব ছোটখাট সংঘাত হয়েছে, সেগুলোর খবরও অত্যন্ত ফলাও করে প্রকাশিত হচ্ছে এবং এই খবরগুলো সীমান্ত সম্পর্কে আমাদেরকে অনেক বেশী সজাগ এবং সচেতন করছে। আমাদের সীমান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে, বিশেষ করে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে এতো বিস্তারিত মিডিয়া কভারেজ আর কখনো হয়নি। পত্রপত্রিকাগুলো এই সুবাদে বিভিন্ন বিষয়ে নিবন্ধ, সীমান্তেত্ম মানচিত্র, ছিটমহলগুলির অবস্থান সম্পর্কে মানচিত্র প্রকাশ করেছে, যেটা দেশের সকলস্তরের মানুষের জন্য অত্যন্ত শিক্ষামূলক হয়েছে। এটা আমাদের একটা বিরাট প্রাপ্তি। আমাদের আসল প্রতিরক্ষা হচ্ছে আমাদের জনগণ। সেনাবাহিনী বা বিডিআর-এর পাশাপাশি আমাদের জনগণই হচ্ছে সত্যিকার অর্থে আমাদের সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী।

প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ

আজকে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সীমান্ত পর্যায়ে যা ঘটছে, ১৯৭৪-এর মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি যদি বাস্তবায়িত হতো, তাহলে এগুলো ঘটতো না। ২৬ বছর আগের এই গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি আজও কেন বাস্তবায়িত হচ্ছে না এ সম্পর্কে ভাবা দরকার। সাধারণ পর্যায়ে তো বটেই, বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে, যারা নিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, নিরাপত্তা-পররাষ্ট্র বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন, প্রতিরক্ষা বিষয়ে কর্মরত রয়েছেন, তাদের প্রশ্ন তোলা উচিত যে, এখন পর্যন্ত কেন এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলো না এবং হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি? আমি বলতে চাই, বিশ্বাসও করি অনেকটা পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে, এই চুক্তি বাস্তবায়িত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই ভবিষ্যতে। '৭১-এ বাংলাদেশের জন্ম ভারতের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে কৌশলগত একটি অসঙ্গতি (a strategic irrelivence) হিসেবে দেখা দিয়েছিল। এর দু'টি মাত্রা ছিল, রাজনেতিক এবং নিরাপত্তা বিষয়ক। ১৯৭১-এ বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ দ্বি-জাতি তত্ত্বের মূলে যতোটুকু আঘাত করে তা থেকে অনেক বেশী বিক্ষত করে এক-জাতি তত্ত্বের

www.pathagar.com

ভিত্তিমূলকে পর্যন্ত। বিশেষ করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যের মুখে এই ভারত মহাসাগরের উপকূলে বঙ্গোপসাগরের ধারে বাংলাদেশের অবস্থান। এই শতাব্দীতে বড় বড় শক্তিগুলোর শক্তি পরীক্ষার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠবে ভারত মহাসাগর, কাজেই বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও ভারতের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। বাংলাদেশ এবং নেপালের মধ্যে ১৮/২০ মাইল ব্যাপী চিকেন-নেট নামে পরিচিত ভূমিসেতুটি ভারতের মূল ভূখণ্ড, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাথে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের যোগসূত্র। যদি কোনোভাবে এই ভূমিসেতু শিলিগুড়ি করিডোর অন্য কোনো বৈরী শক্তির হাতে আসে, তখন ভারতের সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিচ্ছিন্ন হবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রের স্বার্থে, রাষ্ট্রের জনগণের স্বার্থে যদি কোনো কিছু করতে হয় তাহলে হয় শক্তি অর্জন করা প্রয়োজন, না হলে এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ যা অপরের শক্তির ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। এটিই তো ভারসাম্যের রাজনীতি। আজকের যে সমস্যা, এর জন্য যেমন জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন এমন একটা অবস্থান তৈরী করা যা ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তি হিসেবে কাজ করবে। আমাদের এই প্রতিবেশী ভারত না হয়ে চীন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কিংবা অন্য কোনো বড় রাষ্ট্র হলেও নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে এবং নিজেদের রক্ষা করতে আমাদের কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হতো। জে.এন. দীক্ষিতের *Liberation beyond*-এর ২৩২ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করে লেখা "Sheikh Mujib was worried about existing domination by a fenced neighbour." ১৯৭৬ সাল থেকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে যে পরিবর্তন সূচীত হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, মুসলিম বিশ্বে মধ্যপ্রাচ্য, পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চীনের সাথেও, যার ফলে ৮০-র দশকের শেষ পর্যন্তও ভারতের এই আধিপত্যবাদের (hegemony) যে আকাঙ্খা, আজকে যেটা লক্ষ্য করছি, এটা জন্মলাভ করেনি। আমরা ভারতের সাথে যুদ্ধ করার আকাঙ্খা পোষণ করি না, করার কোনো কারণ নেই, সঙ্গত নয়, সম্ভবও নয়। আজকের বিশ্বায়নের যুগে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যবর্তী অবস্থানে বাংলাদেশের কৌশলগত যে অবস্থান, তা উভয়ের কাছে সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের যা করণীয় তা হলো, পররাষ্ট্রনীতিকে সম্প্রসারিত করা এবং সুনির্দিষ্ট একটি নিরাপত্তানীতি নির্ধারণ করা যা বৃহত্তর প্রতিবেশী ভারতের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ভারসাম্যের শক্তি হিসেবে কাজ করবে। কিভাবে হবে সেটা পাবলিক মিটিং-এ বক্তৃতার বিষয় নয়। এ

www.pathagar.com

সম্পর্কে যারা সচেতন এবং যারা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে ওয়াকেবহাল তাদের এই প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে।

এ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম

মায়ের বিপদে যেমন বিনা প্রশ্নে সন্তান ঝাঁপিয়ে পড়ে, তদ্রুপ মাতৃভূমির বিপদেও মাতৃভূমির সন্তানেরা ঝাঁপিয়ে পড়বে, এটাই স্বাভাবিক। সেই প্রেক্ষিতে দেশের সীমান্তের পাহারায় নিয়োজিত সশস্ত্র বিডিআর সদস্যগণ তাদের দায়িত্ব পালনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আমরা যারা সৈনিক নই, নাগরিক সমাজে অন্যান্য পেশায় ব্যস্ত, আমাদের কাজ হচ্ছে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে এই সৈনিকদের পাশে দাঁড়ানো। পাদুয়া এবং রৌমারী সীমান্তে বিগত মাসের ঘটনাবহুল উত্তাল দিনগুলিতে ম্যাপ ছাপিয়ে, নক্সা এঁকে, বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে দেশবাসীকে ঘটনার সঙ্গে পরিচিত রাখতে বেশীরভাগ সংবাদপত্রই সচেষ্ট ছিল।

বাংলাদেশের সীমান্তে উদ্বেগজনক ঘটনাবলীর জন্য অন্যতম দায়ী হচ্ছে ভারত-বাংলাদেশ সীমানা চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়া। বাস্তবায়ন না করার জন্য আমাদের প্রতিবেশী ভারতকে দায়িত্ব নিতে হবে। আপনাদের প্রতি আমাদের বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত কিন্তু সেটি নিঃশর্ত নয়। প্রধান শর্ত হচ্ছে, আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে এবং সেই সঙ্গে আমাদের জনগণের সংশ্লিষ্ট অনুভূতিকে আপনাদের সম্মান করতে হবে। বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং পত্রিকার কলাম লেখক জনাব হাসনাত আব্দুল হাই ১১ মে *দ্য ডেইলী স্টার* পত্রিকায় একটি কলাম লিখেছেন যার শিরোনাম ছিল *The Burden of Gratitude*, যার বাংলা মানে অনেকটা দাঁড়ায় 'কৃতজ্ঞতাবোধের প্রয়োজন বা পরিধি'। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করে ভারতবাসী যে বন্ধুত্বের প্রমাণ দিয়েছিলেন সেই অনুভূতিকে নবায়ন করার প্রয়োজনিয়তা দেখা দিয়েছে। আমরা ভারতবাসীর প্রতি ১৯৭১-এর জন্য কৃতজ্ঞ, কিন্তু সম্মানের বিনিময়ে নয়।

জনাব মিজানুর রহমান খান

আজকের সেমিনারের যা বিষয়বস্তু, যে সমস্যা সুরাহার জন্য গত ৪৩ বছরের ব্যবধানে ২টি ঐতিহাসিক চুক্তি সই হয়েছে। প্রথমটি হয় ১৯৫৮ সালে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুন স্বাক্ষরিত এ চুক্তির কিছুটা বাস্তবায়িত হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা

www.pathagar.com

অর্জন করে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৪ সালের ১৬ মে দিল্লীতে '৫৮ সালের চুক্তিকেই ভিত্তি করে নতুন এক স্থলসীমান্ত চুক্তি সই করেন। রৌমারীর দুর্ভাগ্যজনক সংঘাতের পর '৭৪ সালের চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়টি এখন সামনে এসেছে। এই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য ভারত বাংলাদেশকে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু এটা এখনও জানা যায়নি যে, ভারত চুক্তি বাস্তবায়ন প্রশ্নে তার অবস্থান বদল করেছে কিনা। প্রথম কথা হলো রেটিফিকেশন। ভারত বলে আসছে, রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্ধারণ কাজ পুরোপুরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত রেটিফিকেশন হবে না। দু'দেশের ৪ হাজার কি.মি. সীমান্তের দেড় হাজার কিলোমিটারের বেশী এলাকার মাপ পূর্ব পাকিস্তান আমলে শেষ হয়। বাকী ২৫০০ কি.মি. সীমানা চিহ্নিত করতে কেটেছে ২৭ বছর। আর গত ৩ বছরেরও বেশী সময় বেরুবাড়ী সংলগ্ন দৈখাতা মৌজার দেড় কি.মি., ত্রিপুরা সেক্টরের মুহুরী নদী এলাকায় ২ কি.মি. এবং আসাম সেক্টরের লাঠিটিলায় ৩ কি.মি. – এই সাড়ে ৬ কি.মি. সীমানা নির্ধারণ নিয়ে অচলাবস্থা বিরাজ করছে।

ছিটমহল বিনিময় হলে বাংলাদেশ ১০ হাজার ৪৮ দশমিক ৩ একর জমি অতিরিক্ত পাবে। এ জন্য বাংলাদেশকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। এই সমঝোতা ১৯৫৮ সালেই হয়। কয়েক বছর আগে উভয় দেশের জরিপ বিভাগ কর্তৃক ছিটমহলের সম্মত তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এবং এর পরই ভারত জানিয়ে দেয় ছিটমহল বিনিময় করতে হলে ভারতের সংবিধান সংশোধন দরকার হবে।

অপদখলীয় এলাকার আওতায় বাংলাদেশের দখলে ভারতের ৩০২৪ একর জমি এবং ভারতের দখলে বাংলাদেশের ৩৫০৬.৩১ একর জমি রয়েছে বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে বলা হয়েছে। অপদখলীয় জমি বিনিময়ের সঙ্গে সংবিধান সংশোধনের প্রশ্ন আসে না। এমনকি রেটিফিকেশনের সঙ্গেও এ কাজটি সম্পন্নের কোনো সম্পর্ক থাকার কথা নয়। কিন্তু লক্ষণীয় যে, ভারত সরকার মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির পরে কৌশলে অপ্রয়োজনীয়ভাবে অপদখলীয় এলাকা বিনিময় প্রশ্নটি রেটিফিকেশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চিঠি দিয়ে চুক্তি সংশোধনের প্রস্তাব কবুল করিয়ে নেয়। এ ব্যাপারে ভারতের যে সর্বশেষ আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব তা আবার মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির সমঝোতার একেবারেই পরিপন্থী। ভারত চায়, অপদখলীয় এলাকা উভয় দেশের দখল অনুযায়ী অঙ্গীভূত করে নেয়া। এতে ভারত বাড়তি ৪৮২ একর জমি বেশী পাবে। ভারত এর জন্য হয়তো ক্ষতিপূরণ দিতেও রাজি হবে না।

কিন্তু ভারতের সংবাদপত্রের সাম্প্রতিক বক্তব্য দেখে মনে হয়, ভারত সরকার বাংলাদেশের সঙ্গে '৭৪ সালের চুক্তি বাস্তবায়নে সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নটি বড়

www.pathagar.com

করে তুলছে। ভারতের বন্ধুপ্রতিম জনগণকে এ ব্যাপারে ভারতের সরকারগুলো সঠিক তথ্য দিচ্ছে কিনা তা আমার মনে হয় খতিয়ে দেখার সময় এসেছে। *আনন্দবাজার পত্রিকা* গত ২৪ এপ্রিল 'সীমানা এতকাল অচিহ্নিত?' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে চুক্তি বাস্তবায়নে বিলম্বের জন্য সরকারের সমালোচনা করে বলা হয়,'তবে সেজন্য সংসদের উভয় সভায় যে দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার সাহায্যে সংবিধান সংশোধন প্রয়োজন বাজপেয়ী সরকারের তা নেই।' আমার বক্তব্য হলো, সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন না হয় বুঝলাম। কিন্তু সে জন্য কি দুই-তৃতীয়াংশের গরিষ্ঠতা সত্যিই অপরিহার্য? আমি এ বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি কোনো মতামত না দিয়ে এ বিষয়ে কেবল কয়েকটি তথ্যের অবতারণা করছি।

ভারতের সংবিধানের আওতায় 'ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া' এবং 'টেরিটরি অফ ইন্ডিয়া' – এই কথার মধ্যে ফারাক করা হয়েছে। ভারত ইউনিয়নের মধ্যে ২৫টি রাজ্য অন্তর্ভুক্ত। ফেডারেল কাঠামোর ভেতর এই রাজ্যগুলোতে নির্বাহী ক্ষমতা বণ্টিত রয়েছে। 'টেরিটরি অফ ইন্ডিয়া'য় কিন্তু তা নেই। 'টেরিটরি অফ ইন্ডিয়া' বা ভারতের ভূখণ্ড বলতে এমন সব ভূখণ্ডকে বোঝায়, যার উপর ভারতের সার্বভৌমত্ব সময় বিশেষের জন্য বহাল রয়েছে। 'টেরিটরি'তেও আবার প্রকারভেদ রয়েছে। প্রথমত ইউনিয়ন টেরিটরি, এবং দ্বিতীয়ত এমন টেরিটরি যা ভারত অর্জন করে নিয়েছে বা নিতে পারে।

১৯৮৭ সাল থেকে ভারতের 'ইউনিয়ন টেরিটরি' রয়েছে ৭টি — দিল্লী, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ, দাদরা এবং নাগর হাভেলি, দমন ও দিউ, পণ্ডিচেরি এবং চণ্ডিগড়। এই এলাকাগুলো 'প্রশাসক' নিয়োগের মাধ্যমে প্রেসিডেন্টের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শাসিত হয়।

এছাড়া অন্যান্য এমন ভূখণ্ড, ভারত যা কোনো সময় জয়, ক্রয়, ট্রিটি বা অন্যভাবে অর্জন করতে পারে তা 'টেরিটরি অফ ইন্ডিয়ার' অন্তর্ভুক্ত হবে। ভারত সরকার তার সংবিধানের ২৪৬(৪) অনুচ্ছেদের আওতায় পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের মাধ্যমে এইরূপ এলাকা শাসন করে থাকে। গত বৃহস্পতিবার পণ্ডিচেরিতে বিধান সভার নির্বাচন হল। এই পণ্ডিচেরি ছিল ফরাসি সরকারের অধীন। ১৯৫৪ সালে ফ্রান্স সরকার এই এলাকাটির স্বত্ব ভারতকে দেয়। কিন্তু ১৯৬২ সালের আগ পর্যন্ত পণ্ডিচেরি কেবলই ভারতের 'অর্জিত ভূখণ্ড'-এর মর্যাদা পায়। কারণ এই সময় পর্যন্ত ফ্রান্সের পার্লামেন্ট পণ্ডিচেরি ছেড়ে দেয়ার ট্রিটি রেটিফাই করেনি। ফ্রান্সের রেটিফিকেশন বা অনুসমর্থনের পরে ১৯৬২ সালের ডিসেম্বরে ভারতের পার্লামেন্ট

www.pathagar.com

সাধারণ গরিষ্ঠতায় সংবিধান সংশোধন করে পণ্ডিচেরিকে 'ইউনিয়ন টেরিটরি'র মর্যাদা দেয়।

তাই আমাদের একটু জানা দরকার যে, ১৯৫৮ ও ১৯৭৪ সালের চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের সীমান্তের ভূখণ্ডগুলো ভারতের সংবিধানের আওতায় ঠিক কি মর্যাদা পাচ্ছে। অপদখলীয় জমির সার্বভৌমত্ব নিয়ে আইনানুগ কোনো প্রশ্ন নেই। তবে ছিটমহলের ইতিহাস ভিন্ন। সংক্ষেপে বলছি। কুচবিহার ও রংপুর মহারাজার জমিদারীর অনেক ক্ষুদ্র অংশ (ছিটমহল) ব্রিটিশ শাসকের আওতাভুক্ত ছিল না। এজন্য র‍্যাডক্লিফ বাউন্ডারি কমিশন বিপাকে পড়ে। স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ দু'টি নতুন দেশের সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব পালন করেন, ইতিহাসে যা 'র‍্যাডক্লিফ এ্যাওয়ার্ড' নামে পরিচিত। র‍্যাডক্লিফ কমিশন কুচবিহার ও রংপুর জেলার সীমানার সমন্বয় ও পরিবর্তন সাধন করেন। এ সময় স্বায়ত্বশাসিত হিন্দু জমিদারদের জমিদারী এবং কুচবিহার মহারাজার রাজ্যের ক্ষুদ্র এলাকাগুলো উভয় দেশের এলাকার মধ্যে পড়ে। আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া ব্যতীত একটি দেশের অংশ সম্পূর্ণরূপে অন্যদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ার এমন উদাহরণ পৃথিবীতে বিরল। মজার ব্যাপার হলো, অনেক ছিটমহলের ভিতরেও কিন্তু ছিটমহলের অস্তিত্ব রয়েছে। তবে এক মহারাজার জমিদারীতে অন্য মহারাজার জমি কিভাবে সৃষ্টি হলো সে সম্পর্কে নানা মত রয়েছে। বলা হয়ে থাকে, রংপুর ও কুচবিহারের জমিদারগণের মধ্যে পাশা খেলা হতো। এই খেলায় 'বাজি' হিসেবে নির্দিষ্ট কোনো নামের ক্ষুদ্র অঞ্চলকে ধরা হতো। এই খেলার পরিণতিতে উভয় মহারাজার এলাকায় আলোচ্য ছিটমহলের উদ্ভব ঘটে। লক্ষণীয়, দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান ছিটমহল কিন্তু কেবল বৃহত্তর রংপুর ও কুচবিহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পাকিস্তানের অভ্যন্তরের বিভিন্ন ছিটমহলের ভারতীয় বাসিন্দারা ভারতের পতাকা এবং ভারতের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ছিটমহলের পাকিস্তানী বাসিন্দারা পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন করেন। কিন্তু ৫৪ বছরের বাস্তবতা হচ্ছে, এই ছিটমহলগুলো বরাবরই সরকারী প্রশাসনের নাগালের বাইরে। ছিটমহলগুলোতে নাগরিক বসবাসের ব্যাপারে কোনো দেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোনো প্রকার নীতিমালা ছিল না এবং বর্তমানেও নেই। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরও অবস্থার তেমন কোনো হেরফের ঘটেনি। বাংলাদেশে কুচবিহারের ছিটমহল সংখ্যা ১১৪টি। মোট আয়তন ২৯.৫৭৫ বর্গমাইল। এর মধ্যে বেরুবাড়ীর দক্ষিণাংশ সংলগ্ন ৩টিসহ দিনাজপুর জেলায় ৩৯টি (আয়তন ২১.২৫২ বর্গমাইল) ও রংপুর জেলায় রয়েছে ৭৫টি (৮.৩২৩ বর্গমাইল) ছিটমহল। ভারতের কুচবিহারে বাংলাদেশী ছিটমহল ৫৪টি, মোট আয়তন ১৮.৪৪৮

www.pathagar.com

বর্গমাইল। এর মধ্যে রংপুরে পড়েছে ৫৩টি (১৮.৩৬৭ বর্গমাইল), দিনাজপুরে পড়েছে মাত্র ১টি ছিটমহল (.০৮১ বর্গমাইল)।

এই ছিটমহলগুলোর হস্তান্তর প্রশ্নে নুন-নেহরু এবং মুজিব-ইন্দিরা চুক্তিতে মৌলিক কোনো তফাৎ নেই। অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন, ১৯৭৪ সালের চুক্তি যদি নাও হতো তবে ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী ১৯৫৮ সালের চুক্তি অনুসারেও দু'দেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় সম্ভব ছিল।

দু'দেশের ১৬৮টি ছিটমহলের বাসিন্দারা ইতিহাসের উদ্বাস্তু হয়ে দিন কাটাচ্ছে। জানা যায়, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় চিলাহাটির নিকটবর্তী মেখলীগঞ্জ ছিটমহলে ভারত একটি পুলিশের দল পাঠাতে সক্ষম হয়। ১৭ জনের এই দলটি স্থানীয় জনসাধারণের হাতে আটকা পড়ে এবং কোনোক্রমে আটক অবস্থা হতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এরপর থেকে ছিটমহলে সরকারী প্রশাসনের কোনো আনাগোনা নেই। কোনো উন্নয়ন কাজ নেই। নেই কোনো বিচার ব্যবস্থা। ভারতীয় ছিটমহলে হিন্দু-মুসলমানের জনসংখ্যার অনুপাত ৪০ ও ৬০। বাংলাদেশী ছিটমহলে হিন্দু-মুসলমানের জনসংখ্যার অনুপাত ২০ ও ৮০। সব ছিটমহলে তাই মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

ছিটমহলে কোনো ভোটার তালিকা করা হয়নি। বাসিন্দারা কোনো নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে না। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ৫০টি ছিট বিশেষ করে বড় বড় ছিটমহল এক সময় ছিল উত্তরবঙ্গের সকল প্রকার সন্ত্রাসমূলক কার্য পরিচালনায় নক্সালীদের মূল ঘাঁটি।

এখন প্রশ্ন হলো, ছিটমহল বিনিময় হবে কিভাবে এবং কবে? ভারতের সংবিধান সংশোধনের যে কঠোর ধারণা আমাদের সামনে হাজির করা হয় তা কতোটা প্রাসঙ্গিক? ভারতের সংবিধান সংশোধন করতে হলে সব ক্ষেত্রেই যে দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দরকার হয় তা কিন্তু নয়। ভারতের সংবিধানেই বলা আছে, কোনো ক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশ ও কোনো ক্ষেত্রে সাধারণ গরিষ্ঠতার প্রয়োজন হবে। এ সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদের আওতায় নতুন রাজ্য গঠন, রাজ্যের সীমা পরিবর্তন ও বিলোপ ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট বিষয় বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট বিধান সভায় প্রেরণ করেন। তিনি যে সময় বেঁধে দেন তার মধ্যেই মতামত দিতে হয়। এই মতামত গ্রহণ প্রেসিডেন্টের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। এর পর সাধারণ গরিষ্ঠতায় আইন পাস হয়।

খ্যাতনামা ভারতীয় বিচারপতি দুর্গাদাস বসুর বই থেকে জেনেছি, ভারতের সংবিধানের এই অনুচ্ছেদের আওতায় ১৯৫১ সালে 'দ্য আসাম (অলটারেশন অফ বাউণ্ডারিজ) এ্যাক্ট'-এর মাধ্যমে ভুটানের কাছে ভারত এক খণ্ড জমি হস্তান্তর করে।

www.pathagar.com

১৯৬০-এ 'দ্য এ্যাকোয়ার্ড' টেরিটরিজ (মার্জার) এ্যাক্ট'-এর আওতায় পাকিস্তানের সঙ্গে ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ সালের স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী কিছু ভূখণ্ড অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। একই চুক্তির আওতায় ভারত সরকার যখন আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু ভূখণ্ড তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের কাছে হস্তান্তরের উদ্যোগ নেয় তখন মামলা হয়। 'বেরুবাড়ী ইউনিয়ন মামলা' খ্যাত এই মামলায় ভারতের সুপ্রীমকোর্ট কিন্তু উক্তরূপ হস্তান্তরের সিদ্ধান্তকে সমুন্নত রাখেন। কোর্ট অবশ্য বলেন যে, কোনো বিদেশী রাষ্ট্রকে ভূখণ্ড দিতে হলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। এই পটভূমিতে ১৯৬০ সালের ২৮ ডিসেম্বর নবম সংশোধনী পাস হয় যা ১৯৬১ সালের ১৭ জানুয়ারিতে কার্যকর হয়। নবম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের প্রথম তফসিল সংশোধন করা হয়। বিচারপতি বসু মন্তব্য করেছেন, যে সব কারণে দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা দরকার হয় তা নবম সংশোধনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না।

আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে ভারত পর্তুগীজ ছিটমহল দাদরা এবং নাগর হাভেলী লাভ করে। ১৯৬২ সালে সংবিধানের দশম সংশোধনীর মাধ্যমে এই প্রথম তফসিল সংশোধন করেই ভারত কিন্তু এই ছিটমহল দু'টিকে তার ইউনিয়ন ভূখণ্ডের অংশে পরিণত করে। সাধারণ গরিষ্ঠতায় এই সংশোধনীগুলো পাশ হয়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সেদিন নুন-নেহরু চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নবম সংশোধনীর পক্ষে মতামত দেয়।

সুতরাং *আনন্দবাজার* পত্রিকা তার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বিজেপির দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা নেই বলে যে ধরনের জটিলতার আশঙ্কা করেছে তা হয়তো সঠিক নাও হতে পারে। তবে যদি দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার সত্যি প্রয়োজন হয়, আর ভারতে যদি পরবর্তী সংসদ নির্বাচনেও ঝুলন্ত পার্লামেন্টের উদ্ভব ঘটে তাহলেও কি জটিলতার দোহাই দেয়া যৌক্তিকতা পাবে? আমি মনে করি, বেসরকারী পর্যায়ে এ নিয়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। যদি দেখা যায় যে, সাধারণ গরিষ্ঠতা সাপেক্ষে সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে ছিটমহল ইস্যুর নিষ্পত্তি সম্ভব, তা হলে সে কথা ভারতের মিডিয়া জনসাধারণের কাছে ভালোভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশের তরফে উক্ত নবম সংশোধনীর আওতায় ছিটমহল হস্তান্তরে ভারতকে অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু ভারত তা অগ্রাহ্য করে।

ভারত সরকারীভাবে যুক্তি দিয়ে চলেছে যে, সীমানা নির্ধারণ শেষ হবার পরেই চুক্তি রেটিফাই করা হবে। কিন্তু রেটিফিকেশন হলেই ভারত ছিটমহল বিনিময় করতে প্রস্তুত থাকবে না। ১৯৯৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের একটি আন্ত-মন্ত্রণালয়ের সভার কার্যপত্রে তথ্য দেয়া হয়, ছিটমহল বিনিময় করতে

www.pathagar.com

হলে ভারতের সংবিধান সংশোধন করতে হবে বলে ভারতীয় দূতাবাস থেকে প্রাপ্ত বার্তায় জানা গেছে।

১৯৭৪ সালের মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির অনুচ্ছেদ-২ এ অপদখলীয় জমির কথা বলা আছে। মুজিব-ইন্দিরা চুক্তিতে উভয় দেশের মধ্যে অপদখলীয় জমি অবিলম্বে বিনিময়ের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। এ সংক্রান্ত সব কাজ ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭৫-এর মধ্যে সম্পন্ন করারও বাধ্যবাধকতা ছিল। কিন্তু জাতির জনকের মৃত্যুর পরপরই ভারত অপদখলীয় জমি সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে একতরফা পরিবর্তন আনে। এক্ষেত্রে ভারত ওই সময়সীমা বিলোপ করে রেটিফিকেশন সাপেক্ষে এই কাজ সম্পন্নের শর্ত দেয় এবং বাংলাদেশ তা মেনে নেয়। '৭৪ সালের চুক্তি অনুযায়ী, বাউন্ডারি স্ট্রীপ ম্যাপ উভয় দেশের প্লেনিপোটেনশিয়ারি (বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত) কর্তৃক স্বাক্ষরিত হওয়ার পর অপদখলীয় এলাকা হস্তান্তর হওয়ার কথা। কিন্তু স্ট্রীপ ম্যাপ প্লেনিপোটেনশিয়ারি কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হলে অপদখলীয় এলাকা হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব নয়। মূল চুক্তিতে ম্যাপ সইয়ের কাজ সর্বোচ্চ '৭৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করার নির্দেশনা ছিল।

সুখের বিষয়, '৭৪-এর চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষে দু'দেশের মধ্যে আলাপ-আলোচনার তোড়জোড় চলছে। তবে মনে রাখতে হবে, কেবল কর্মকর্তা পর্যায়ে আলোচনা চললে প্রত্যাশিত সুফল মিলবে না। এ ব্যাপারে দরকার বৃহত্তর রাজনৈতিক সদিচ্ছার। উভয় দেশের শীর্ষ পর্যায়ে বৈঠকের মাধ্যমে সুরাহা না করা হলে চুক্তি বাস্তবায়ন আরও পিছিয়ে যাবে। বিশিষ্ট ভারতীয় কূটনীতিক জে.এন. দীক্ষিত সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এইসব বিরোধপূর্ণ এলাকা আয়তনে খুবই ছোট। এ সব যদি আমাদের ভূখণ্ড সম্পর্কিত অখণ্ডতার দিক থেকে কিছুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ না হয় তাহলে তা আমাদের ছেড়ে দেয়া উচিত।'

ছিটমহল ও অপদখলীয় এলাকার ইতিহাস চিহ্নিত করে যে ভারতের 'ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া' বা 'ইউনিয়ন টেরিটরি'র সংজ্ঞা অনুযায়ী তা কোনোভাবেই ভারতের ভূখণ্ড সম্পর্কিত অখণ্ডতাকে স্পর্শ করে না। আমার মনে হয়, ভারত যদি সমস্যা সমাধানে সত্যিই আন্তরিক হয় তাহলে তাকে আগে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে, পরে কর্মকর্তারা অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করবেন। ফারাক্কা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের আগে রাজনৈতিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভুল-শুদ্ধ যাই হোক, তারপরেই কিন্তু ফর্মুলা তৈরী হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও সর্বাগ্রে শীর্ষ নেতৃত্বের কাছ থেকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন।

www.pathagar.com

প্রফেসর দিলারা চৌধুরী

একটা সুনির্দিষ্ট প্রতিরক্ষানীতি বা নিরাপত্তানীতি গড়ে তোলা দরকার। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে 'ভারত' সব সময়ই আমাদের পররাষ্ট্র নীতিনির্ধারকদের উপরে চাপ তৈরী করে রেখেছে এবং বাংলাদেশ প্রথম থেকেই ভারতের সঙ্গে একটা সম্প্রীতিমূলক সম্পর্ক রাখার জন্য উদগ্রীব। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, এই অঞ্চলে ভারতের বড়ভাইসুলভ আচরণের জন্য বাংলাদেশের এই সদিচ্ছার কোনো ফল পাওয়া যায়নি। ভারতের একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি অশোক মেহতা একটি নিবন্ধে লিখেছেন যে, ভারতবর্ষ তার আশেপাশের ছোট রাষ্ট্রগুলির জন্য এমন কিছু সমস্যা তৈরী করে রাখে যাতে সে রাষ্ট্রগুলি দুর্বল থাকে এবং সেগুলিকে তারা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। নিজের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বাংলাদেশের সঙ্গেও বিদ্যমান সমস্যাগুলিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ভারতের ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে। যখন আমাদের প্রতিরক্ষানীতি নির্ধারণ করার চিন্তাভাবনা করার সময় এসেছে তখন শুধু আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটকে মনে রাখলে চলবে না, আমাদের প্রেক্ষাপট রাখতে হবে আরো প্রসারিত। যেমন, সমস্ত এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে এখন যে শক্তির উদ্ভব ঘটতে চলেছে তার দিকে আমরা নজর রাখতে পারি। যারা নীতি নির্ধারণ করবেন, তাদের সামনে এই বিষয়টি উপস্থাপন করার প্রয়োজন রয়েছে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তার সবচাইতে বড় যে হাতিয়ার সেটা হলো, জনগণের মধ্যে দৃঢ়তা বা একতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমাদের এই একসঙ্গে দাঁড়ানোর প্রবণতাটা অত বেশী দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সুতরাং যারা রাজনৈতিক নেতৃত্বে রয়েছেন তাদের সবচাইতে আগে প্রয়োজন হবে আমাদের দেশকে একতাবদ্ধ করা, জাতীয় সংহতি বজায় রাখা এবং দেশকে গড়ে তোলা। জাতি হিসেবে আমরা যতদিন দুর্বল থাকবো ততদিন দুর্বল পররাষ্ট্রনীতি সম্প্রসারিত করে অথবা প্রতিরক্ষানীতি নির্ধারিত করে তেমন কোনো সুফল আশা করা যাবে না।

জনাব আনোয়ার হাশিম*

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ১৮ এপ্রিলের দুঃখজনক ঘটনা শুধু উভয় দেশের সরকার নয়, বরং দুই দেশের সচেতন এবং দায়িত্বশীল নাগরিকদের মনেও গভীর ছাপ ফেলেছে। এই দুই দেশের সার্বিক সম্পর্কের উপর সীমান্ত সম্পর্কিত ঘটনাবলীর যে গুরুত্ব রয়েছে তা নিরপেক্ষ ও সুস্পষ্টরূপে চিন্তা করতে হবে।

www.pathagar.com

আমাদের জনগণের অন্তত ৫টি আকাঙ্ক্ষা আমার চোখে ধরা পড়েছে। প্রথমত, পরিস্থিতির যেন আরো অবনতি না ঘটে এবং সীমান্তে যাতে উত্তেজনা বৃদ্ধি না পায় সে লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা চালানো। দ্বিতীয়ত, সীমান্তের দু'ধারে যেন এ ধরনের আর কোনো ঘটনা না ঘটে, কোনো সৈন্য কিংবা গ্রামবাসী যেন নিহত না হয়, কোনো গ্রাম যেন আর আগুনে না পোড়ে, গবাদিপশু ধরে নিয়ে যাবার ঘটনা যেন আর না ঘটে, নিজের ভিটে থেকে আর কেউ যাতে উচ্ছেদ না হয়, আর কেউ যেন ভয়ে পালিয়ে না যায়। তৃতীয়ত, ভবিষ্যতে যেন সীমান্তে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থা ঘোষণা করা, অতিরিক্ত সৈন্য মোতায়েন করা এবং ট্রেঞ্চ খোঁড়ার কোনো কথা না ওঠে। চতুর্থত, এ ধরনের অভিব্যক্তি প্রকাশকে কেউ যেন ভীতি প্রদর্শন, অবাঞ্ছিত প্রবেশ, আগ্রাসন, অভিযান, আত্মরক্ষার অধিকার ও বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে উসকানিমূলক বলে ব্যবহার করার চেষ্টা না করে। পঞ্চমত, বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে ৪১৫৬ কি.মি. সীমান্ত যেন স্থায়ী শান্তি এবং বন্ধুত্বে রূপান্তরিত করা যায়। আমি বিশ্বাস করতে চাই যে, উভয় পক্ষের যদি সদিচ্ছা থাকে এবং যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হয়, তবে এই সমস্যার সমাধান অবশ্যই সম্ভব। এর জন্য ভারতকে তার সংসদে ১৯৭৪-এর চুক্তি রেটিফাই করতে হবে। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে অপদখলীয় এলাকা নিয়ে সমস্যা আইনগতভাবে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। এটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে ভবিষ্যতের প্রত্যেকটি আলোচনা হবে পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার ভিত্তিতে। 'জোর যার মুলুক তার' কিংবা 'আমাকেই জিততে হবে' – এই ধরনের মানসিকতা নিয়ে কোনো শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব নয় এবং এ লক্ষ্যে কৌশলগতভাবে ধীরে চলা নীতি গ্রহণও কাম্য নয়। অপর দিকে, এই সমস্যাগুলোর আশু সমাধান বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের উন্নতি সাধনে অর্থপূর্ণ ভূমিকা রাখবে তাই না, বরং নৌসীমান্ত, তালপট্টি ও নিউ মুর দ্বীপ, ভারত-বাংলাদেশের অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন এবং গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির কার্যকারিতা বজায় রাখতে ফলপ্রসু আলোচনার সম্ভাবনা দেখা দেবে। উভয় দেশের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ রক্ষার কারণেই এই সমস্যাগুলোকে হারিয়ে যেতে দেয়া যাবে না। উভয় দেশের নেতৃবৃন্দকে নিজেদের কথাকে কাজে এবং সুচিন্তিত সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করার পদক্ষেপ নিতে হবে। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে বন্ধুত্ব চাপিয়ে দেয়ার বিষয় নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদী বন্ধুত্বের জন্য প্রয়োজন আস্থা, পারস্পরিক সমঝোতা এবং বিশ্বাসের মজবুত ভিত্তি।

www.pathagar.com

জনাব সাইফুল ইসলাম (লাল মিয়া)

রৌমারী সীমান্তের যে এলাকায় বিডিআর-বিএসএফ সংঘর্ষ হয় সেখানে আমার বাড়ী এবং সেই হামলার সম্মুখীন আমি হয়েছিলাম। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আপনাদের আমি এতোটুকুই জানাবো যে, আমাদের উপর ভারত যে নির্যাতন করে সেটা আসলেই খুব কঠিন ব্যাপার। মাঝে মাঝে তারা এভাবে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণের উপর অত্যাচার করে। অনেক সময় দেখা যায় তারা গুলি করে বাংলাদেশ থেকে লাশ নিয়ে যায় কিন্তু সেটা প্রতিবাদ করার মতো ক্ষমতা আমাদের নেই, করতেও পারি না।

১৮ এপ্রিল ভোরে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি প্রচণ্ড শব্দে। তাড়াতাড়ি উঠে বাড়ীর দক্ষিণ দিকে গিয়ে দেখি লোকজন দৌড়াদৌড়ি করছে, কান্নাকাটি করছে। কি ব্যাপার জানার জন্য দৌড়ে গেলাম, অনেকে বলল যে ভারত থেকে বিএসএফ আসছে। আমি ভাবলাম, মাঝে মাঝে বিএসএফ এভাবে এসে হামলা করে আবার চলে যায়, হয়তো আসছে, চলেও যেতে পারে। একজন বলল,"না ডাক্তারসাব তাড়াতাড়ি দৌড়ান, বিএসএফ-এ হামলা করছে, মারপিট করছে।" আমি একটু দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি অনেক বিএসএফ, অন্ধকারে অসংখ্য কালো পোষাক চোখে পড়ল। এ অবস্থায় আমি গ্রামের লোকদের বললাম যার যার বাড়ীর পিছনের ডোবায় নামতে, যদি গুলি হয় তবে যেন নিরাপদে থাকতে পারে। আমি দৌড়ে ক্যাম্পে গেলাম, বিডিআর ভাইয়েরা যারা ডিউটিতে ছিলেন তাদেরকে জানালাম যে আমাদের গ্রামের ভিতরে বিএসএফ প্রবেশ করেছে, তারা যেন সতর্কতা অবলম্বন করেন। হাবিলদার নজরুল আমার কাছে বিএসএফ-এর অবস্থান জানতে চাইলে আমি বললাম,"আপনাদের বাংকারের সামনে তাকিয়ে দেখেন।" বাংকার থেকে ২০ গজ পরেই রাত্রের অন্ধকারে এসে তারা নিজেরাই ওখানে বাংকার তৈরী করেছে। বাংকার তৈরী করার জন্য বিএসএফ কোদাল, বেলচা নিয়ে এসেছিল, আমরা সেইখানে সেগুলো পেয়েছি। বলার সাথে সাথে উনি দৌড়ে বাংকারে গেলেন এবং আমাকেও বললেন,"লাল ভাই আপনি একটু আসেন, সাহায্য করেন।" আমিও দৌড়ে আরেকটা বাংকারে ঢুকলাম। ঢোকার সাথে সাথেই বৃষ্টির মতো গুলি শুরু হয়ে গেল। গ্রামের লোকজন জীবন বাঁচানোর তাগিদে দৌড়াদৌড়ি শুরু করল। কেউ গরু-বাছুর, ছাগল-ভেড়া ইত্যাদি নিয়ে দৌড়াতে লাগলো। বৃষ্টির মতো চতুর্দিকে গুলি হচ্ছে, তার ভেতর দিয়ে লোকজন যাচ্ছে, আল্লাহর রহমতে কারো কোনো গুলি লাগছে না। গুলি সামনে পড়ছে, বালু

www.pathagar.com

উড়ছে, বোমা এসে পড়ছে ভারত থেকে, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কারো গায়ে লাগছে না। আমি বাংকারেই ছিলাম, এ সময় বিডিআর-এর জওয়ান ল্যান্স নায়েক ওয়াহিদ মারা গেলেন গুলি খেয়ে। ঐখানে গুলিতেই তার ঠিক মুখ থেকে বুক পর্যন্ত ঝাঁঝরা হয়ে গেল। গুলিটা খুব দূর থেকে আসেনি, আমার মনে হলো ২০ গজ দূর থেকে গুলিটা এসে তার গায়ে লেগেছে। আমাদের বিডিআর ক্যাম্পের পুকুরের ঐ পার্শ্বেই তারা ডিফেন্স করছে এবং ঐ ডিফেন্স থেকেই গুলি করেছে। আমার পাশে আরো দুইজন বিডিআর-এর জওয়ান ছিল। তারা বলল,"এটা কি হইল লাল ভাই।" আমি বললাম, "ভাইঙ্গা পড় না, তোমরা ভাইঙ্গা পড় না, আল্লাহর নাম স্মরণ করো, আল্লাহর ধ্বনি দিয়া হবেই আমাদের জয়, যুদ্ধ করবোই আমরা।" তার যে হাতিয়ারটা পড়ে ছিল সে হাতিয়ারটা আমি ব্যবহার করেছি, আমি পরপর তিনবার আনসার ও ভিডিপি-এর ট্রেনিং করেছি, হাতিয়ার আমার চালানোর অভ্যাস ছিল। তাই আমি হাতিয়ারটা তুলে তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলাম। সাড়ে ন'টার দিকে বিডিআর-এর ভাইয়েরা আমাকে বলল,"লাল ভাই, আমাদের গুলি ফুরিয়ে যাচ্ছে। হয়তো বা আমরা টিকে থাকতে পারবো না।" তখন চতুর্দিক থেকে গুলি আসছে, এ রকম আক্রমণ আমি জীবনেও দেখিনি। আমাদের বিডিআর ক্যাম্প থেকে ৫০০ গজ পশ্চিমে বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকে তারা ডিফেন্স করছে। ঐখান থেকে তারা গুলি করছে পূর্ব দিকে। এ অবস্থায় বিডিআর-এর ভাইয়েরা বলল যে,"আমাদের রাউণ্ড শেষের দিকে, লাল ভাই কি করবো এখন।" আমি বললাম,"কোনো চিন্তা করবেন না রাউণ্ড আমি পৌঁছাবো, যেভাবেই হোক রাউণ্ড ক্যাম্পে আসবেই। আপনারা চিন্তা করবেন না। আপনারা চালিয়ে যান।" ঝড়ের মতো গুলি হচ্ছে, গুলির ভিতরেই আমি আমার সহকর্মী দুইজনকে নিয়ে ক্যাম্প থেকে ক্রলিং করে চলে এলাম গুলি সংগ্রহের জন্য। ৫০০ গজ পিছনে এসে দেখি নদীর ভিতরে বিএসএফ ভর্তি। আমি এক পর্যায়ে অবশ্য ভাবছিলাম যে, এরা বাংলাদেশের বিডিআর-ই হবে, হয়তোবা তারা সংবাদ পেয়ে পিছন থেকে আসছে। কিন্তু দেখলাম, না, এরা বিএসএফ। বিএসএফ ইচ্ছা করলেই আমাকে হাত দিয়া ধরতে পারতো। আল্লাহর রহমতে আমাকে তারা গুলি না করে বলল,"এই শালা বাঙাল হট যাও, হট যাও।" যখন আমাকে এই কথাটা বলল, তখন আমি নিশ্চিত হলাম যে, হয়তোবা আমাকে গুলি করবে না। ঐ সময় আমি ঐখান থেকে ৫০ গজ পিছনে কিভাবে এসেছি আমি জানি না, বলতেও পারি না। আমার ছোট ভাই রিপন, আমার মামাও দেখেছি বিডিআর-এর সাথে থেকে যুদ্ধ করছে। চলে আসার পরে আর তারা আমাকে দেখে দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করলো,"কি ব্যাপার তুমি এভাবে আসছ, গুলি লাগে নাই?" আমি বললাম,"না,

www.pathagar.com

গুলি লাগে নাই। এখন পিছনে আমাদের বাঁচাইতে হবে, এই বুদ্ধি কি?" তারা আমাকে জানালো যে, উত্তর পার্শ্বে হিজলমারী ক্যাম্প থেকে বিডিআর এসেছে, দক্ষিণ পার্শ্বে সহরচর ক্যাম্প থেকে বিডিআর এসেছে। তাদের সহযোগিতা করার জন্য আমি উত্তর পার্শ্বে চলে গেলাম, গিয়ে তাদেরকে বললাম,"তোমরা আরো পূর্বে যাও, ক্যাম্পের পূর্বে থেকে এসে পশ্চিমে ফায়ার দাও।" পশ্চিমে ফায়ার দিলে হয়তোবা তারা এইখানে রাস্তাটা ছেড়ে দেবে। ক্যাম্পে যাওয়ার মতো আমাদের কোনো রাস্তা নেই। এই রাস্তাটা কিছুটা ছেড়ে দিলে আমরা হয়তো গুলি ক্যাম্পে পৌছাতে পারবো। বিডিআর-এর ভাইয়েরা আমাকে বলল,"ঠিক আছে লাল ভাই, আপনি সাথে আসেন।" তাদের সাথে গিয়ে ক্যাম্পের পূর্বে এসে ঐদিক থেকে পশ্চিমে আমরা ফায়ার দিলাম। এই ফায়ার দিতে হচ্ছে উঁচু দিয়ে, কারণ নীচ দিয়ে ফায়ার দিলে গ্রামের লোকজন মারা যেতে পারে। অনেক কষ্ট করে আমাদের এই বিডিআর-এর জওয়ানরা দেশ বাঁচিয়েছে। যারা মারা গেছেন, আমি তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করি এবং যারা বেঁচে আছে তাদেরকে সরকার হয়তো উপাধি দেবেন। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, ঐ এলাকার জনগণ সরকারের পক্ষে কোনো ধন্যবাদ পায়নি। অনেকেই গেছেন, এলাকার পরিস্থিতি দেখেছেন। এখন ধান কাটার সময়, মর্মাহত জনগণ এলাকায় যেতে পারছে না, আর গেলেও তারা ভয়ে থাকতে পারছে না। এভাবে আমরা সেখানে অবস্থান করছি। রাত্রে আমরা ডিউটি করছি বিডিআর ভাইদেরকে নিয়ে। তাই আপনাদের কাছে আমি জোরতর অনুরোধ করবো যে, সেখানে একটা টিম পাঠিয়ে আপনারা সরেজমিনে তদন্ত করে এসে দেখে ঐ এলাকার জনগণের নিরাপত্তার জন্য যদি কিছু ব্যবস্থা নিতেন এবং এর পাশাপাশি কিছু আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করতেন, আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতাম।

জনাব আব্দুল হক*

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্য, যেমন অঘোষিত এবং অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য, সংঘটিত হয় দু'ভাবে-অবৈধ এবং বৈধভাবে। অবৈধ উপায়ে মাদকদ্রব্য, ফেনসিডিল, অস্ত্র প্রভৃতি নিষিদ্ধ পণ্য বাংলাদেশে আমদানী করা হয়, এছাড়া ভারত থেকে রপ্তানীর জন্য নিষিদ্ধ, যেমন গরু প্রভৃতি, পণ্য বাংলাদেশে প্রবেশ করে শুল্ক ফাঁকি দেয়ার জন্য। প্রকৃত তথ্য না জানিয়ে, সংখ্যায় কম দেখিয়ে কিংবা দাম কম দেখিয়ে প্রকৃত তথ্য গোপন করে নিষিদ্ধ পণ্যও অনেক সময় বৈধ উপায়ে বহন করা হয়ে থাকে। স্থানীয় আইন রক্ষাকারী সংস্থাগুলোকে ঘুষ দিয়ে এ

www.pathagar.com

ধরনের কাজ চালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সীমান্ত এলাকার গুদামগুলোকে এ কাজে ব্যবহার করা হয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ঘুষ দেয়ার প্রমাণ দেখাতে না পারলে অনেক সময় তারা পণ্য এবং এর সাথে জড়িত ব্যক্তিদের ধরে নিয়ে যায়। তবে তা লোক দেখানো, কয়েকদিন পরেই পূর্বের ব্যবস্থা অনুযায়ী এদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। অবৈধ পণ্য আমদানীতে সাধারণত মূল্য পরিশোধ করা হয় নগদ মুদ্রায়, পণ্য বদল করে, সোনা, হুণ্ডি কিংবা তৃতীয় কোনো দেশের মাধ্যমে। ১৯৯৭-৯৮ সালে বিআইডিএস অবৈধ পণ্যের অনুপ্রবেশ ঘটে এ রকম সীমান্তবর্তী ৪৯টি এলাকা চিহ্নিত করে, এদের মধ্যে ৫টি থানায় তারা একটি জরিপ চালায়। জরিপে দেখা যায় অবৈধভাবে আমদানীকৃত পণ্যের মধ্যে রয়েছে গবাদিপশু, মাছ, হাঁস-মুরগী, কৃষিপণ্য, প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য, কাপড়, প্রসাধন সামগ্রী, থালা-বাসন, স্টেশনারী, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, যানবাহনের খুচরা যন্ত্রাংশ, বিভিন্ন ধরনের পণ্য, এছাড়া বিভিন্ন পণ্য যেমন ফেনসিডিল, মাদকদ্রব্য ও অস্ত্র।

১৯৯৭-৯৮ সালে জরিপকৃত থানার অবৈধ আমদানীর পরিসংখ্যান

থানার নাম	১ মাসে পণ্যের অনুপ্রবেশের হার (মিলিয়ন টাকায়)	১ বছরে অবৈধ পণ্যের অনুপ্রবেশের হার (মিলিয়ন টাকা)
শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ	১৩৮.২৬	১৬৮৬.৯২
শার্শা, যশোর	৩১৮.৪২	৩৮৬২.৯২
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া	১৩৪.৯৭	১৬৭৫.৫৪
কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা	৬৪.৭	৭৮৬.৯
কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার	২৮.৫	৩১০.২
মোট	৬৮৪.৪২	৮৩২২.০৯

তাছাড়া বাংলাদেশ থেকে যেসব পণ্য অবৈধভাবে রপ্তানী করা হয় তার মধ্যে রয়েছে সোনা (হুণ্ডিবাজারে এবং মূল্য পরিশোধে ব্যবহৃত) রূপা, তামা, পিতল, লোহা, ইলিশ মাছ, জাপান ও কোরিয়া থেকে আমদানীকৃত উন্নতমানের কাপড়, পান-সুপারী, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি, গ্যাস সিলিন্ডার, ভিসিআর, ভিসিপি, ব্যবহৃত জামা-কাপড়, জামদানী শাড়ী, ক্যামেরা, শুটকি, মুদ্রা, নাট-বোল্ট ইত্যাদি। জরিপকৃত সময়ে এগুলোর মূল্যমান ছিল ১৮৬৪.০৭ মিলিয়ন টাকা যা মোট অবৈধ রপ্তানীর ২২.৪%।

'৯০ দশকে ভারত থেকে বৈধ আমদানী উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেড়েছে। বাংলাদেশ সরকার পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি তুলে দেয়ায় এবং আমদানী শুল্ক হ্রাস করার নীতি গ্রহণ করায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। রপ্তানীর তুলনায় আমদানীর

www.pathagar.com

হার অনেক বেশী হওয়ায় বাণিজ্য ভারসাম্য হ্রাস পেতে থাকে। রপ্তানীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশী পণ্য শুল্কমুক্ত রপ্তানী সুবিধা না পাওয়া, আমদানী পণ্যের উপর ভর্তুকী, প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কম দামে বিক্রিত পণ্যের উপর বিক্রয় করে ছাড় প্রভৃতি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। পর্যাপ্ত সম্পদ না থাকায় আমরা 'সাপটা'র আওতায় ন্যূনতম মূল্য সংযোজন সুবিধাটুকু থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। অবৈধ আমদানী সরকারকে রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করছে, অপরদিকে আমদানী স্থানীয় শিল্প গড়ে উঠতে বাধার সৃষ্টি করছে। যেহেতু অবৈধ রপ্তানীতে সোনাকে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং আমাদানীকৃত সোনা আবারও রপ্তানী করায় তা আমাদের সম্পদের উপর, বিশেষ করে বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষণের উপর চাপ তৈরী করছে। দেশের রাজস্ব ব্যবস্থা ও স্থানীয় শিল্পকে রক্ষা করতে আমাদের সরকারগুলো ব্যর্থ হয়েছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মূল দায়িত্ব হচ্ছে দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা করা। অথচ নিজেদের কাজের ক্ষেত্রে কোনটি প্রাধান্য পাবে তা নির্ণয়ে তারা দুঃখজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। পত্রিকার খবর অনুযায়ী ত্রিপুরা সীমান্তে মদ ও ফেনসিডিল তৈরীর কারখানা গড়ে উঠেছে যাতে অবৈধ আমদানী আরো সহজতর হয়। মাত্র ৩ ব্যাটালিয়ন বিডিআর সৈন্য তেলিয়াপাড়া থেকে ফেনীর আলমনগর পর্যন্ত ১৭৫ কি.মি. দীর্ঘ সীমান্তরেখায় চোরাচালানী রোধ করার জন্য যথেষ্ট নয়। রাতের বেলা অধিকাংশ অবৈধ বাণিজ্য সংঘটিত হয় বলে তা রোধ করার জন্য আরো সৈন্য প্রয়োজন। আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় দিক থেকে ভারত বাংলাদেশ থেকে উপকৃত হচ্ছে। ভারতকে বছরে দু'হাজার কোটি টাকার বাজার উপহার দেয়ার পরও সীমান্ত সংঘর্ষ কেন হচ্ছে তা নিয়ে চিন্তার করার সময় এসেছে।

জনাব আবুল হাসনাত মঞ্জুরুল কবীর*

প্রচলিত এবং আধুনিক তথ্য প্রবাহপথ ব্যবহার করে ভারতীয় গণমাধ্যম বিডিআর ও বিএসএফ-এর মধ্যে সংঘঠিত সাম্প্রতিক দুঃখজনক সীমান্ত সংঘর্ষ সম্পর্কিত অপপ্রচার চালিয়ে বিশ্বজুড়ে ভুল বোঝাবুঝি এবং বির্তকের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল বিডিআর-কে ক্রিমিনাল এ্যাডভেঞ্চারিজম বা অপরাধমূলক রোমাঞ্চ অভিযানে লিপ্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত করা। ভারতীয় পুলিশ স্টেশনে 'আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধী' হিসেবে অভিযুক্ত করে বিএসএফ বিডিআর-এর বিরুদ্ধে প্রাথমিক তথ্য রিপোর্ট (এফআইআর) পেশ করার ফলে পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করেছি। 'বিএসএফ সৈন্যদের দেহ বিকৃত করার' অভিযোগ করে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল ফায়দা লোটার এবং আন্তর্জাতিক

www.pathagar.com

মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কাছে বাংলাদেশকে হেয় করার চেষ্টা করেছে। কাজেই কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারণা নেয়া প্রয়োজন ঃ

১. আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর অধিকার — কয়েকটি অত্যুৎসাহী ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে যে, এই এফআইআর এবং তৎপরবর্তী ঘটনাসমূহ, যা ধুবরির নিম্ন আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে, আন্তর্জাতিক আদালত অথবা আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনালে ভারত যে মামলা করতে যাচ্ছে তার প্রস্তুতি মাত্র। কোনো স্থায়ী আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত অথবা ট্রাইবুনাল না থাকায়, এ ধরনের উদ্যোগ হলো বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিকভাবে হেয় করার একটা কৌশল মাত্র। ভারত আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে, তবে সেটা যথেষ্ট কঠিন হবে। আন্তর্জাতিক আদালত সংবিধির ৩৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হচ্ছে ঃ "(ক) পক্ষসমূহ কর্তৃক আদালতের নিকট পেশকৃত সকল মামলা এবং জাতিসংঘের সনদ অথবা বলবৎ চুক্তি বিংবা অস্থায়ী চুক্তিসমূহে যে সব বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে বিধান করা হযেছে, সেই সব বিষয়ে আদালতের এখতিয়ার থাকবে।' (খ) বর্তমান সংবিধির রাষ্ট্রসমূহ যে কোনো সময় ঘোষণা করতে পারে যে, তারা অন্য যে রাষ্ট্র অনুরূপ বাধ্যবাধকতা স্বীকার করবে সেই রাষ্ট্রের সম্পর্কে, নিম্নলিখিত বিষয়াবলীর সাথে সংশ্লিষ্ঠ মহল আইনগত বিরোধের ব্যাপারে, স্বতঃই এবং কোনো বিশেষ চুক্তি ব্যতিরেকে আদালতের এখতিয়ার বাধ্যতামূলক বলে স্বীকার করে; (১) কোনো চুক্তির ব্যাখ্যা; (২) আন্তর্জাতিক আইনের যে কোনো প্রশ্ন; (৩) কোনো ঘটনার বিদ্যমানতা যা কোনো আন্তর্জাতিক দায়িত্বের লঙ্ঘন বুঝায়; (৪) কোনো আন্তর্জাতিক দায়িত্ব লঙ্ঘনের জন্য দেয় ক্ষতিপূরণের প্রকৃতি ও পরিধি।"

কোনো সুনির্দিষ্ট বিবাদের ঘটনায় বাধ্যতামূলক বিচারকার্য পরিচালনার জন্য কোনো চুক্তি না থাকায় বাংলাদেশের অনুমোদন ছাড়া ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করতে পারবে না। আর এ ধরনের ছোটখাট সীমান্ত সংঘর্ষ নিয়ে বিশেষ আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল গঠনের প্রশ্নই ওঠে না, যেখানে ভারত নিজেই অনুপ্রবেশকারী এবং বেসামরিক বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা করার যথেষ্ট প্রমাণ ভারতের বিরুদ্ধে রয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশের সাথে স্বাক্ষরিত ১৯৭৪-এর একমাত্র সীমান্ত চুক্তিটি রেটিফাই করা থেকে বিরত থাকা সীমান্ত চিহ্নিতকরণ বিষয়ে শান্তিপূর্ণ সমাধানে ভারতের আগ্রহের অভাবই প্রমাণ করে। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, বিএসএফ সদস্যদের দেহ বিকৃত করা হয়নি, বরং দিনের আলোয় দীর্ঘ সময় পড়ে থাকার জন্য সেগুলোতে পচন ধরেছিল। তাদের ময়না তদন্ত রির্পোটও ভারতীয় অপপ্রচারকে সহযোগিতা করেনি। কাজেই বিডিআর-কে

www.pathagar.com

'যুদ্ধাপরাধী' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার ভারতীয় প্রচেষ্টা ভিত্তিহীন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে 'ঘৃণ্য অপপ্রচার'।

২. 'যুদ্ধাপরাধ' খোঁজার ভারতীয় প্রচেষ্টা — বিডিআর-এর সদস্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের যে অভিযোগ করা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের রোম সংবিধির অনুচ্ছেদ-৮ অনুযায়ী সেই যুদ্ধাপরাধের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে (পূর্ববর্তী অন্যান্য চুক্তি/সংবিধির কথা স্মরণে রেখে)ঃ "(ক) কোনো পরিকল্পনার অংশ অথবা কাজ অথবা এ ধরনের বড় আকারের কোনো অপরাধের অংশ হিসেবে সংঘটিত কোনো কাজকে বিশেষভাবে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য করে আদালত বৈধ হস্তক্ষেপ করতে পারবে। (খ) এই সংবিধি অনুযায়ী 'যুদ্ধাপরাধ' হলো ঃ (১) ১৯৪৯ সালে ১২ আগস্টের জেনেভা কনভেনশন ভঙ্গ করা হবে যদি, যেমন সংশ্লিষ্ট জেনেভা কনভেনশনের শর্তাধীন সংরক্ষিত অধিকারভোগী কোনো ব্যক্তি অথবা সম্পত্তির বিরুদ্ধে, নিম্নলিখিত যে কোনো একটি কাজ সংঘটিত হয় ঃ

(ক) ইচ্ছাকৃত হত্যা;
(খ) অত্যাচার অথবা অমানবিক ব্যবহার করা যার মধ্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত;
(গ) ইচ্ছাকৃতভাবে কারো জন্যে তীব্র কষ্টের কারণ হওয়া, অথবা শরীর অথবা স্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতি করা;
(ঘ) বেআইনীভাবে এবং যথেচ্ছাপূর্বক সম্পদের ব্যাপক ধ্বংসসাধন এবং আত্মসাৎকরণ, যা সামরিক প্রয়োজনে করা হয়নি;
(ঙ) কোনো যুদ্ধবন্দী বিংবা অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে শত্রুশক্তি-কে সেবা দানে বাধ্য করা;
(চ) কোনো যুদ্ধবন্দী কিংবা অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে অবাধ ও নিয়মিত বিচার পাবার অধিকার থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বঞ্চিত করা;
(ছ) বেআইনী নির্বাসন অথবা স্থানান্তর অথবা বেআইনী কারাবাস;
(জ) জিম্মি করা .....।"

উপরোক্ত সংজ্ঞার ভিত্তিতে এটা স্পষ্ট যে বিডিআর যুদ্ধাপরাধ করেনি, বরং আত্মরক্ষার খাতিরে অনুপ্রবেশকারী বিএসএফ সদস্যদের প্রতি গুলি ছুঁড়েছে বাংলাদেশ ভূখণ্ডগত সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য। ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে জিরো লাইনের দিকে পাদুয়ায় যে পাকা রাস্তা বিএসএফ নির্মাণ করছিল তা আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। জাতিসংঘ সনদের ২(৪) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সদস্য রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও

www.pathagar.com

রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে, অথবা জাতিসংঘের উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সম্পৃক্ত কোনো উপায়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে"।

৩. আত্মরক্ষার অধিকার — আত্মরক্ষার অধিকার যে কোনো জাতির অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই অধিকার, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয় পর্যায়ে, আন্তর্জাতিক আইনে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। জাতিসংঘ সনদের ৫১ নং অনুচ্ছেদে বলা হচ্ছে, "নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত জাতিসংঘের কোনো সদস্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো সশস্ত্র আক্রমণ দেখা দিলে তার বিরুদ্ধে একক বা সমষ্টিগত আত্মরক্ষার আদিম অধিকারকে বর্তমান সনদের কোনো বিধান দ্বারা ক্ষুণ্ন করা যায় না।" অনুপ্রবেশকারী বিএসএফ সদস্যদেরকে দেশের ভৌগলিক অখণ্ডতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে গুলি করার জন্য বিডিআর-কে যুদ্ধাপরাধের দোষে দোষী করা যায় না। দেহ বিকৃতির অপপ্রচারের কোনো বাস্তবসম্মত ও উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি আইনগতভাবে দায়বদ্ধ কোনো বাহিনীকে ভারত দোষী করতে পারে না।

৪. মানবাধিকার সংগঠনগুলোর ভূমিকা — মানবাধিকার কর্মীরা তাদের ভূমিকা পালনে দুঃখজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। অধিকাংশ মানবাধিকার এনজিওগুলো বিরোধপূর্ণ এলাকায় কোনো 'সত্যাসত্য তদন্ত দল' পাঠানোর প্রয়োজনও বোধ করেনি। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চলছে সেই আন্তর্জাতিক আলোচনায় মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা কোনো কিছু তুলে ধরতে পারেনি। সাম্প্রতিক সীমান্ত সংঘর্ষ, সত্যি বলতে, 'নিরাপদ অবস্থানে থেকে' প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেয়ার দিকেই তাদের বেশী আগ্রহের বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছে, যা মূলত গণমাধ্যমগুলোর খবরের উপরে ভিত্তি করেই দেয়া হয়েছে। স্থানীয় মানবাধিকার এনজিওগুলো, যাদের ECOSOC মর্যাদা রয়েছে, তাদেরকে ২০০২ সালে মানবাধিকার কমিশনের পরবর্তী বৈঠকে সীমান্ত সংঘর্ষের উপর ভারতীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সম্ভাব্য হস্তক্ষেপের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

মেজর (অবঃ) আখতারুজ্জামান

স্বাধীনতার পর গত তিরিশ বছরে অনেকবার সরকার পরিবর্তন হলেও কেউই দেশের সীমান্ত নির্ধারণ করতে পারেনি। এই ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব কেউই বহন না করে বরং বারবার অপ্রস্তুত ও ঢাল-তলোয়ারবিহীন বিডিআর-কে সীমান্তে ঠেলে দিচ্ছে। অচিহ্নিত সীমান্তে বিডিআর বড়জোর কাউকে মারতে পারবে অথবা নিজেরা মরতে পারবে। কিন্তু উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বুকের রক্ত

www.pathagar.com

দিয়েও সীমান্ত সুনির্দিষ্ট করতে পারবে না। অথচ সীমান্ত চিহ্নিত করতে প্রয়োজন পেন্সিলের দাগ। উভয় দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঠিক সিদ্ধান্তে ক্ষুদ্র সার্ভেয়ার পেন্সিল সীমান্তরেখা সুনির্দিষ্ট করে দেবে। কিন্তু আজকে সেই কাঠের পেন্সিলকে না ধারালো করে আমরা উভয় দেশ শান দিচ্ছি আমাদের অস্ত্রে। পাদুয়া-রৌমারীর ঘটনা দেখে মনে হয় সীমান্ত যেন বাংলাদেশ ও ভারতের জন্য নয়, বরং তা বিডিআর ও বিএসএফ-এর দখলে। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের যেন কিছুই করার নেই। এটা উভয় দেশের নেতৃবৃন্দের জন্য লজ্জার। আমি বাজি ধরে বলতে পারি বিডিআর-বিএসএফ আগামী ১০০ বছরে কেন ১০০০ বছরেও এই সীমান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবে না।

প্রফেসর আফতাব আহমাদ

যে ছবিটি ছাপা হয়েছে, আমি তার জন্য আদৌ দুঃখিত নই এবং দুঃখ প্রকাশ করছি না। কয়েকজন বিডিআর অফিসারসহ রৌমারীর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কয়েকজনের সাথে আলোচনা করে জেনেছি যে, বাংলাদেশের আলোকচিত্রীদের তারা অনুরোধ করেছিলেন যেন তারা ছবিটি প্রকাশ না করেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে শুরু করে বসনিয়াসহ পৃথিবীর যে সব স্থানে সংঘাত হয়েছে, যে পক্ষেরই আলোকচিত্রী যান, তাদেরকে কর্তৃপক্ষ যখন অনুরোধ করে, তারা সেটা মেনে চলেন। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের আলোকচিত্র সাংবাদিকরা এই দায়িত্বটা পালন করেননি, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। কথায় বলে, "There is something called decleared war, something called undeclared war, there is something called two nations at war and something called two nations in conflict." আক্রান্ত হলে বিডিআরসহ যে কোনো প্রতিরক্ষাবাহিনীর দায়িত্ব হলো পাল্টা আঘাত হেনে আক্রমণ প্রতিহত করা। সে সময় তাদেরকে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় না। বিডিআর-কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ঐ জন্যই। এটা প্রশ্ন করার ব্যাপার নয়। আমাদের পত্রপত্রিকার দেশপ্রেমিক সাংবাদিকরা এটি প্রমাণ করেছেন যে পাদুয়ায় বিডিআর মহাপরিচালক যে অভিযান চালিয়েছেন, তা তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে নয়, বরং তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পূর্ণ সম্মতি এবং আদেশের ভিত্তিতে পরিচালনা করেছেন। রৌমারীতে যা ঘটেছে তা ভিন্ন বিষয়, এবং এই জিনিসটা আমাদের বুঝতে হবে। অথচ এ ব্যাপারে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে কোনো বক্তব্য দেয়া হয়নি। আমাদের হাইকমিশনার মহোদয় যে

www.pathagar.com

কথা বললেন খুবই দুঃখজনক। জে. ফজলুর রহমান নির্দোষ নন বলে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন? আপনি কি বলতে চাইছেন যে তিনি একজন যুদ্ধাপরাধী? আপনি কি বলতে চাইছেন যে বিডিআর-এর উচিত ছিল বিওপি ছেড়ে দিয়ে হাত তুলে পালিয়ে আসা? অথবা ভারতের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করা? সীমান্তে এতোবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, হরতাল তো দূরের কথা, একটা প্রতিবাদ সভা পর্যন্ত হয়নি, ধানমণ্ডি ২ নং সড়কে 'বগুড়া হাউজ' ঘেরাও করতে একটা লোকও যায়নি। কেন? এখানেই আসছে আসল কথাটা, আমাদের নিরাপত্তা নিহিত আছে একতাবদ্ধ থাকার মধ্যে। আমরা যতো ছোটই হই না কেন, আমাদেরকে গণনার মধ্যে ধরতে হবে। এশিয়ার ভবিষ্যত রাজনীতিতে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। আমরা দূরপ্রাচ্য এবং নিকটপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে সেতুস্বরূপ। অথচ আমাদের ভূ-কৌশলগত অবস্থান নিয়ে আমরা চিন্তা করছি না। 'মানবাধিকার' বিষয়টি বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে আলোচিত একটি বিষয়, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের। কিন্তু আমাদের মানবাধিকার কর্মীরা কোনো পদক্ষেপ নেননি। সংঘর্ষে কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা নির্ধারণের ব্যাপারেও কেউ কোনো উদ্যোগ নেননি। 'বাংলাদেশ সোসাইটি ফর এনফোর্সমেন্ট অফ হিউম্যান রাইটস্' সংগঠনের পক্ষ থেকে এ্যাডভোকেট এলিনা খান রৌমারীতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার সরেজমিনে তদন্ত করে একটি প্রতিবেদন তৈরী করেছেন। সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী বিওপি-র পাশে বড় ৪টি বাড়ী ছিল যা পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে, মোট ৮০টা ঘরে আগুন দেয়া হয়েছে, ১৫০০ জন লোক বাস্তুহারা হয়েছে এবং এই সংঘর্ষের ফলে আর্থিক ক্ষতি এক কোটি টাকার কম নয়। এখন আমাদের কি করণীয় তা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে। শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে আমরা যুদ্ধ চাই না, কিন্তু যদি আক্রান্ত হই তবে অবশ্যই পাল্টা আঘাত হানবো। সেই প্রস্তুতি আমাদের নিতে হবে। সম্পদের অপ্রতুলতা এবং উন্নয়নশীল কর্মকাণ্ডের প্রতি বাজেটে অগ্রাধিকার-এর প্রাধান্যের কারণে একটা বিশাল আর্মি তৈরী করা আমদের পক্ষে সম্ভব নয়। বর্তমানে যে শক্তি আছে, এটাকে যতোটুকু আধুনিকায়ন করা দরকার অবশ্যই আমরা করবো, কিন্তু দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে ১৮ বছরের উর্দ্ধে সবাইকে আমাদের অবশ্যই বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি ভারতের সংবিধানের ৯ম সংশোধনীর পরিপন্থী। কারণ এই সংশোধনী অনুযায়ী ভারতের ১২নং দক্ষিণ বেরুবাড়ী ইউনিয়ন স্বাধীনতাপূর্ব পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হিসেবে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত। অথচ ভারত তাদের সংবিধান সংশোধন করে বেরুবাড়ী দাবী করার আগেই আমরা নিজেদের সংবিধান সংশোধন করে, এমনকি বেরুবাড়ীর অধিবাসীদের মতামত না

www.pathagar.com

নিয়েই, এলাকাটি ভারতের হাতে তুলে দেই। আমি মনে করি, যদি আমরা এই বিষয়টি আন্তর্জাতিক আদালতে উত্থাপন করতে পারি, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছে আবেদন জানাতে পারি তবে এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব, এবং এভাবে আমরা একটি আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তুলতে পারবো। এই দায়িত্ব দেশের নাগরিকবৃন্দের, বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর, সেই সাথে বামপন্থী দলগুলোরও।

জনাব এম সফিউল্লাহ*

একজন জুনিয়র অফিসার হিসেবে ১৯৭৪-এর সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের সময় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলে আমি ছিলাম। *দ্য ডেইলী স্টার*-এ গত ৭ই মে ২০০১ সংখ্যায় আমি সেই সময়ের পরিস্থিতি এবং চুক্তির প্রেক্ষাপটের উপর আলোকপাত করেছি। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি বন্ধুত্বহীন রূপ নিতে শুরু করে ১০ জানুয়ারী ১৯৭২ সাল থেকে, যেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভারতীয় এয়ারক্র্যাফটে না ফিরে একটি বৃটিশ এয়ারক্র্যাফটে দেশে ফিরে আসেন। তখন থেকেই চীন এবং বিভিন্ন আরব দেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু চেষ্টা চালিয়ে যান। এক দেশ আমার স্বার্থ সংরক্ষণ করছে না বলে অপর দেশের কাছে ছুটে যাব — এটাই পররাষ্ট্রনীতি নয়। জাতীয় স্বার্থ এভাবে পরিবর্তিত হয় না, বরং তা স্থায়ী। নিজের প্রয়োজনে আমরা আমাদের পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন আনবো। আশেপাশের ছোট দেশগুলোকে আমরা এক্ষেত্রে উপেক্ষা করতে পারি না। ডঃ দিলারা চৌধুরীর সাথে আমি একমত যে ছোট দেশগুলোর সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা হল জাতীয় ঐক্য। ছোট দেশগুলোর পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ তাদের প্রথম কাজ হচ্ছে দেশ উন্নয়নে ব্যস্ত থাকা। কাজেই ছোট দেশগুলোর জন্য নিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরী এবং এক্ষেত্রে সবচেয়ে পছন্দের বিষয় হবে দেশের মানুষের মধ্যে নিরাপত্তার অনুভূতি সৃষ্টি করা। গণতান্ত্রিক দেশে সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। সীমান্তে কি ঘটছে তা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং বিদেশী সংবাদ মাধ্যম থেকে আমরা জানছি। এর ফলে আমরা বিস্তারিত তথ্য পাচ্ছি এবং জানতে পারছি ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে। কাজেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোকে দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থে তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বিদেশে আমাদের ভাবমূর্তি অনেকটাই ক্ষুণ্ন হয়েছে তাদের কারণে।

www.pathagar.com

জনাব মাহমুদুল ইসলাম

ছবিটা তোলার পর বিডিআর-এর পক্ষ থেকে ছবিটা না ছাপানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। আমাদের জাতীয় পত্রিকা এই ছবিটি ছাপেনি, এটি একটি বিদেশী সংবাদ মাধ্যম 'এএফপি' পত্রিকায় প্রকাশ করেছে। ছবিটি যেহেতু রৌমারী এলাকার, এ কারণে ছবিটি বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায়ও ছাপা হয়েছে। ছবিটি এএফপি সাংবাদিকের তোলা নয়, কোনোভাবে সেটা তারা সংগ্রহ করেছেন।

জনাব সায়ফুল হুদা

যে ছবিটা নিয়ে বিতর্ক সেটা আসলে একক ব্যক্তির সিদ্ধান্তে প্রকাশিত হয়েছে। যে পত্রিকার সাংবাদিক ছবিটা তুলেছিল, সেও নিজের পত্রিকায় ছবিটা প্রকাশ করেনি।

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন*

আমি এটা ভেবে আশ্বস্ত বোধ করছি যে, পরিস্থিতির যেন অবনতি না ঘটে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সংযম দেখানো হয়েছে। এ ব্যাপারে ভারতীয় কিছু নেতৃবৃন্দ এবং সংবাদপত্রও যথেষ্ট সংযম দেখিয়েছে। সীমান্ত সংঘর্ষের ঘটনা নতুন কোনো বিষয় নয়, তবে বর্তমানের ঘটনাটির মতো এতোটা আলোচিত ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। কয়েকজন দায়িত্বশীল ভারতীয় নেতার সাথে আমার কথা হয়েছে। তারাও একমত হয়েছেন যে সীমান্ত সংঘর্ষ, যা বর্তমানে উত্তেজনা ও অশান্তির জন্ম দিয়েছে, তা শুধুমাত্র ভূখণ্ডগত কিংবা চোরাচালান সম্পর্কিত নয়, বরং তা মানবাধিকারের মতো একটি বড় বিষয়ের সাথে জড়িত। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারীদের কাছ থেকে আমরা জেনেছি তারা কতোটা নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বসবাস করছে, হয়রানির শিকার হচ্ছে, ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে, কিন্তু সমস্যা রয়েই যাচ্ছে। কারণ এই সমস্যা সমাধান করার দায়িত্ব রাজনীতিবিদদের। বিডিআর-এর কার্যক্রম ছিল তাদের নিজেদের সিদ্ধান্তে — এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য কুটনীতির শিষ্টাচার বহির্ভূত এবং এ কথার মাধ্যমে যে দুর্বলতা প্রকাশ করা হয়েছে তা কোনোভাবেই করা উচিত হয়নি। ১৯৭৪ সালের চুক্তি একটি সম্পূর্ণ চুক্তি যেখানে সীমান্ত কিভাবে চিহ্নিত করা হবে সে ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেই চুক্তি যথাযথভাবে মেনে চলা হচ্ছে কিনা। রেটিফিকেশনের প্রয়োজন আছে কিনা, সংবিধান সংশোধন

www.pathagar.com

করতে হবে কিনা সে ব্যাপারে জানার আগ্রহ আমার নেই। এটা আমাদের সমস্যা নয়, ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সমস্যা। এখন প্রয়োজন হলো, দু'দেশের পক্ষ থেকে এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নেয়া। আমি একমত যে, বাংলাদেশ-ভারত উভয় দেশের জন্য বিষয়টি নতুনভাবে জেগে ওঠার একটা ডাক বিশেষ। এ ধরনের পরিস্থিতি উভয় দেশের জন্যই মঙ্গলজনক নয়। ভারতেও এমন একটি গোষ্ঠী রয়েছে যারা মনে করে, সীমান্ত সমস্যা জিইয়ে রাখার কোনো অর্থ নেই। জাতীয় ঐক্যের পাশাপাশি দেশকে স্থিতিশীল রাখারও প্রয়োজন রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মেরুকরণ আমাদের অবস্থানকে দুর্বল করার পাশাপাশি তা আমাদের শত্রুকে উৎসাহিত করছে। আমরা শান্তি চাই, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তা প্রদানকারী ভারতের মতো প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতে রাজী আছি। তবে ভারতের এই সাহায্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল কিনা — সে প্রশ্ন তুললে তা শুধু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করবে। যুদ্ধের কথা বলে লাভ নেই, বরং এখন আমাদের যা করা প্রয়োজন তা হলো, বাস্তববাদী হয়ে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাওয়া। এতো বড় একটা ঘটনা ঘটে যাবার পরেও সমস্যা সমাধানের তাগিদ খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। দুই দেশকে একত্রে বসে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যথেষ্ট তৎপরতা দেখানো প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হলো, ভারত সরকারের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তি আছে যারা বাংলাদেশের সাথে সমস্যার উপর যথাযথ গুরুত্ব দেয়ার ব্যাপারে আগ্রহী নয়। সীমান্ত সমস্যা এমন বড় কোনো সমস্যা নয় যা নিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক বৈরীতায় রূপ নিতে পারে। চীন ও পাকিস্তান ছাড়া অন্য প্রতিবেশীদের অস্তিত্ব শুধুই ভৌগলিক — ভারতের এই মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে। এই বিষয়টিকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে সীমান্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান আমরা খুঁজে বের করতে পারি।

ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) এম সাখাওয়াৎ হোসেন, এনডিসি, পিএসসি

আমার কাছে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এর উপর আমি ৪/৫টি নিবন্ধ লিখেছি। সর্বশেষ নিবন্ধটিতে আমি ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করেছি। ১৯৭৭-৭৯ বিডিআর-এ একজন সেক্টর কমান্ডার থাকাকালীন বিএসএফ-এর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্কের কারণে তাদের মনোভাব আমি বুঝতে চেষ্টা করেছি। এই বিষয়টি আমাদের পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে, বিডিআর-এর একটি বিওপি

www.pathagar.com

কিন্তু ২৪ ঘণ্টা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকে এবং তাদের জন্য এলএমজি, গোলাবারুদ, রেশনসহ প্রয়োজনীয় সব কিছুর বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আপনারা জানেন, বিওপি-তে বাংলাদেশের সীমানায় পতাকা উড়ানো আছে, দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক এই পতাকা যে কোনো মূল্যে রক্ষা করা বিডিআর-এর দায়িত্ব। তাই আগ্রাসনের জবাব দিতে বিওপি কমান্ডারের কারো নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতে হয় না। গত তিরিশ বছরে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যকারী ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক কোন পর্যায়ে গেছে? বিশ্বের ভূ-প্রতিরক্ষামণ্ডলে (geo-strategic atmosphere) ভারত চীন ও পাকিস্তান ছাড়া অন্য কোনো প্রতিবেশী সম্পর্কে আগ্রহী নয়, ভারত মনে করে বাকীরা তার অধীনস্ত। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ভূ-প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের চাইতে আমরা তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছি। অথচ আমরা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখিনি। প্রতিরক্ষার এই শক্তিকে আমরা জাতির সামনে উপস্থাপন করতে পারিনি। প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে ভারতের সম্পর্ক খারাপ হওয়ার জন্য ভারত নিজেই দায়ী। ভারতের জাতীয় পর্যায়ের নেতারা নিজেরাও জানেন না ভারত কোন নীতিতে চলে। সম্ভবত সুব্রামনিয়াম, জে.এন. দীক্ষিত, মি. মিশ্র প্রমুখ এ বিষয়টির উপর কিছুটা আলোকপাত করেছেন। আমাদের ভাবতে হবে, কিভাবে আমরা নিজেদের রক্ষা করবো। বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে শুধু সেনাবাহিনী, সীমান্তরক্ষী বাহিনীই নয়, দেশের জনগণের মধ্যে ঐক্য এ ক্ষেত্রে পথ দেখাতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে দেখা যায়, দেশের সরকার অথবা রাজনৈতিক দলসমূহ এবং জনগণ দু'টো পৃথক সত্তা হিসেবে অবস্থান করে। রাজনীতিবিদদের বুঝতে হবে দূরদৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদের দুর্বলতাটা কোথায়। দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কারো সাথে যুদ্ধ করতে চাই না, বরং জাতি হিসেবে আমরা প্রতিবেশীদের এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বের সামনে সম্মানের সাথে অবস্থান করতে চাই। আসুন একবারের জন্য হলেও আমরা বাংলাদেশী হয়ে উঠি এবং বলি দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে সম্মানিত জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য জাতীয় স্বার্থ অনুযায়ী আমরা কাজ করবো। বিষয়টিকে যেন আমরা রাজনৈতিক মাত্রা না দেই। আমাদের পররাষ্ট্রনীতিকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। গত তিরিশ বছরে বিডিআর-এর অনেক জওয়ান মারা গেছে, গুম হয়ে গেছে, কিন্তু কোনো পত্রিকায় এর কোনো প্রতিফলন চোখে পড়েনি। বিডিআর-এর সেক্টর কমান্ডার থাকাকালীন সময়ে আমার সেক্টরে প্রচুর গুলি হয়েছে, কিন্তু কোনো পত্রিকায় আমি তার কোনো সংবাদ দেখিনি।

www.pathagar.com

ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) মিরান হামিদুর রহমান*

একজন সৈনিক হিসেবে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমি বিষয়টি আলোচনা করতে চাই। মূল কথা হলো, আত্মরক্ষার খাতিরে বিডিআর গুলিবর্ষণ করেছে। এতে যে প্রাণহানি ঘটেছে তার জন্য আমাদের খারাপ লাগে, কারণ ওরাও মানুষ। এখন প্রশ্ন হলো, ১৬ জন বিএসএফ জওয়ান নিহত হওয়ায় ভারত হৈ চৈ করছে, নিজেদের বিওপি-তে আমাদের ৩ বিডিআর জওয়ান নিহত হওয়ায় আমরা কেন হৈ চৈ করতে পারলাম না? তারা তো সীমান্ত অতিক্রম করেনি! তার বদলে ভারতীয় সৈন্যদের দেহ বিকৃতির অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য আমরা ক্রমাগত আত্মরক্ষার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বিডিআর ও বাংলাদেশ সরকারের একক ও যৌথ ভূমিকা নিয়ে ভারত যে হৈ চৈ করছে তা শুধুমাত্র বিভ্রান্তি তৈরী করার জন্য, পুরো বিষয়টিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য। বিডিআর সরকারের কাছে প্রতি-আক্রমণের অনুমতি নিয়েছে কিনা তা আমাদের মাথাব্যথা, ভারতের নয়। তাদের লোকজন কিভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করলো সেটা নিয়ে বরং তাদের মাথাব্যথা হওয়া উচিত। বিডিআর যা করেছে, একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আগ্রাসনের শিকার হলে আমিও তাই করতাম। '৭১-এ আমরা যুদ্ধ করেছি নিজেদের স্বার্থে, ভারত যুদ্ধ করেছে তাদের স্বার্থে। আমরা তাদের তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছি, তারা আমাদের সামরিক সাহায্য দিয়েছে। যুদ্ধের ময়দানে দু'টোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ মানবসম্পদ এবং দেশপ্রেমী জনগণ, আমাদের নেতৃবৃন্দ কি এই সম্পদ আহরণ করার চেষ্টা করেছে? প্রত্যেকটি জাতীয় প্রশ্নে তারা দ্বিধাবিভক্ত। কিছুদিন আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানী হাইকমিশনার ইরফান রাজার অপমানসূচক বক্তব্যে বুদ্ধিজীবীদের এক অংশকে দেখলাম চুপ করে থাকতে, আবার সম্প্রতি বিএসএফ-এর সীমান্ত হামলায় দেখলাম আরেক অংশের বুদ্ধিজীবীরা চুপ করে আছেন। দেশের বুদ্ধিজীবীদের এই ভূমিকা দেশের জনগণের কাছে কোনোভাবেই কাম্য নয়। আসুন, আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রভু হই এবং আমাদের লক্ষ্য স্থির করি। অন্যেরা কেন আমাদের চালিত করবে? আমরা যে বাংলাদেশী সেটা অনুভব করার এটাই সময়। আমাদের কোনো প্রভু নেই, প্রভুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেই আজ আমরা স্বাধীন।

www.pathagar.com

কমোডর (অবঃ) শফিক-উর-রহমান, পিএসসি*

যদিও আজকের আলোচনা মূলত স্থলসীমান্ত নিয়ে, তবুও আমি বিনীতভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, জলসীমান্ত নিয়েও প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের মতানৈক্য রয়েছে। এ বিষয়ে আমি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিচ্ছি। সমুদ্রসীমা চিহ্নিত করা জাতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমুদ্র আইন নিয়ে ১৯৮২ সালের জাতিসংঘের সমঝোতা, যা সংক্ষেপে আনক্লস-৩ (UNCLOS-III) নামে পরিচিত, সেখানে সমুদ্রবেষ্টিত প্রত্যেকটি দেশের জন্য সুস্পষ্ট অধিকার, এখতিয়ার, সার্বভৌমত্ব এবং নির্দিষ্ট সমুদ্র এলাকা হতে জীবিত ও মৃত উভয় ধরনের সমুদ্র সম্পদ আহরণের অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে। বাণিজ্যিক ও কৌশলগত দিক থেকে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা এবং এর সাথে সম্পর্কিত সম্পদ সম্পর্কে কিছুটা জানা দরকার। আমাদের অর্থনীতিতে সমুদ্র একটি জীবনীশক্তি হিসেবে কাজ করে এবং সমুদ্র হলো আমাদের খাদ্য আহরণের অন্যতম উৎস। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সালে প্রণয়ন করে 'দ্য টেরিটরিয়াল ওয়াটার এ্যাণ্ড মেরিটাইম জোনস্ এ্যাক্ট'। কিন্তু ভারত ও মায়ানমার আমাদের এই সমুদ্রসীমা মেনে নেয়নি এবং সমুদ্র এলাকা নিয়ে তাদের দাবী বাংলাদেশের দাবীকে অধিক্রমণ (over lapping) করছে। এই বিষয়টি নিয়ে '৭০ এর মধ্যবর্তী সময় থেকে '৮০ দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত বেশ কয়েকবার সমঝোতার চেষ্টা চললেও সমুদ্রসীমা চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে সমুদ্র উপকূলে গ্যাস ও তেল শক্তির সম্ভাবনা এবং সমুদ্র সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, ভবিষ্যতে আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে এ রকম একটি স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে। এ কারণে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা চিহ্নিতকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আইনগত, প্রযুক্তিগত এবং কূটনৈতিক দিক থেকে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া অত্যন্ত জরুরী।

আনক্লস-৩ এর অধীনে প্রত্যেকটি দেশের জলসীমাকে সমুদ্র তটরেখা থেকে পরিমাপ করে ৬টি আলাদা ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এগুলো হলো — সমুদ্র তটরেখা, অভ্যন্তরীণ জলপ্রবাহ, উপকূলীয় সমুদ্র অঞ্চল, সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চল, চূড়ান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মহীসোপান। সমুদ্র তটরেখা হলো সাধারণত সমুদ্র উপকূলে অগভীর পানির এলাকা [অনুচ্ছেদ-৫(উপকূলীয় দেশগুলোর আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নেয়া জলসীমান্ত এলাকা যা বড় আকারের ম্যাপে চিহ্নিত করা হয়)]।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ব-দ্বীপ সদৃশ নদী প্রবাহের কারণে বিলিয়ন বিলিয়ন টন পলি জমে উপকূলীয় এলাকায় কাদায় ভরে ফেলে বলে আমাদের উপকূলীয় রেখা ক্রমাগত আকৃতি পরিবর্তন করে এবং সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। সর্ব উত্তরে ফানেল আকৃতির সাগরের তীরে অবস্থিত বলে বাংলাদেশের উপকূলরেখার আকৃতি ধনুকের মত ভিতরের দিকে বক্রতাযুক্ত বা অবতল অথচ আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর উপকূলরেখার আকৃতি বৃত্তের মতো ক্রমোন্নত এলাকা বিশিষ্ট বা উত্তল আকৃতির। এ জন্য বাংলাদেশ ১০ ফ্যাদম (৬০ ফুট) সমুদ্র তটরেখা দাবী করে থাকে, নরওয়ে এবং গিনি বিসাউ-এর সাথে এর মিল রয়েছে। ১০ ফ্যাদম তটরেখা থেকে বাংলাদেশ ১২ নটিক্যাল মাইল উপকূলীয় সমুদ্র অঞ্চল, ২৪ নটিক্যাল মাইল সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চল, ২০০ নটিক্যাল মাইল চূড়ান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ৩৫০ নটিক্যাল মাইল মহীসোপান দাবী করে থাকে আনক্লস-৩ অনুসারে। কিন্তু ভারত ও মায়ানমার তা মানতে নারাজ। ১৯৭৪ সাল থেকে ভারতের সাথে ৮ দফা আন্দোলন হলেও এ সমস্যার কোনো মীমাংসা হয়নি। প্রচলিত আইনের মধ্য থেকে তার দাবীর কথা পুনর্ব্যক্ত করলেও ভারত চাইছে সমদূরত্ব এলাকাভিত্তিক সমুদ্রসীমা থেকে এই সীমান্তরেখা চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু করতে। এদিকে দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ নিয়ে সমস্যার সমাধান এখনো হয়নি। সীমান্ত এলাকায় হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মাঝপ্রবাহ তালপট্টি দ্বীপের পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ধরে নিয়ে বাংলাদেশ দ্বীপের মালিকানা দাবী করছে, অথচ ভারত যুক্তি দিচ্ছে যে, এই গতিপথ দ্বীপের পূর্ব দিকে দিয়ে বাহিত হচেছ। ১৯৮০ সালে দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের মালিকানা দাবী করতে ভারত সেখানে একটি বিশাল নৌবহর পাঠায়, যার মধ্যে কয়েকটি ফ্রিগেট এবং এলএসটি ছিল। বাংলাদেশ নৌবাহিনী কয়েকটি গানবোট ও একটি ফ্রিগেট নিয়ে এ ঘটনা সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবেলা করে। বিষয়টি পরে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা হয় এবং উভয় পক্ষ তাদের বাহিনী ফিরিয়ে নেয়। ডিজি-কোস্টগার্ড হিসেবে ১৯৯৬-তে আমি ভারতের ডিজি-কোস্টগার্ড ভাইস এ্যাডমিরাল জ্যাকবের উপস্থিতিতে ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রধান এ্যাডমিরাল ভগবতের সাথে আলোচনা করি। আলোচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ তালপট্টি কিংবা বর্তমানের রৌমারীর ঘটনার মতো ঘটনাগুলোকে যাতে এড়ানো যায় সেজন্য দুই বন্ধুপ্রতিম দেশের উচিত সমুদ্রসীমা যতশীঘ্র সম্ভব চিহ্নিত করা। এটা সত্যি যে, ভারতের মতো শক্তিশালী প্রতিবেশী তার ছোট প্রতিবেশীকে শাস্তি দিতে পারে, কিন্তু দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ কিংবা বর্তমানের রৌমারীর ঘটনা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার ভাবমূর্তি বাড়াবে না, কাজেই উভয় পক্ষের স্বার্থেই এই সীমান্ত সংক্রান্ত সমস্যাগুলো নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক অঞ্চল

www.pathagar.com

চিহ্নিতকরণের ব্যাপারে মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের কোনো ফলপ্রসু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। বিভিন্ন পর্যায়ে ১৯৭৪-১৯৮৮-র মধ্যে বাংলাদেশ-মায়ানমারের মধ্যে ৮ দফা দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা হয়েছে। এক্ষেত্রে মায়ানমারও সমদূরত্ব এলাকাভিত্তিক সমুদ্রসীমা নির্ধারণের দাবী জানাচ্ছে। ভারত-মায়ানমার উভয় দেশের প্রস্তাব মেনে নিলে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা ২০০ নটিক্যাল মাইল অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। এতে মহীসোপানে ৩৫০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত আমাদের প্রবেশাধিকার সীমিত হয়ে পড়বে। নিজের ভৌগলিক আকৃতির কারণে 'বাংলাদেশ প্রিন্সিপ্যাল অব ইকুইটি'-র ভিত্তিতে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এই এলাকার স্থিতিশীলতার পারস্পরিক স্বার্থ এবং ভবিষ্যত উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে যত দ্রুত সম্ভব প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে সৃষ্ট এই সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন।

এ্যাডভোকেট আদিলুর রহমান খান

'৭১ সালে বাংলাদেশের জন্ম প্রমাণ করেছে যে, দ্বি-জাতি তত্ত্বের ধারণাটাই ছিল ভুল। আমাদের এখনকার ধারণা হচ্ছে দক্ষিণ এশিয় বহু-জাতি তত্ত্বের এবং বাংলাদেশের জন্ম দক্ষিণ এশিয় অন্য জাতিসত্ত্বার স্বাধীনতার সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করবে। আজকে যদি আমরা ভারতকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র হিসেবে ধরে নেই, তবে রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের বিরুদ্ধে আমাদের জনগণের সঙ্গে সে দেশের বিভিন্ন এলাকার জনগণের ঐক্যের প্রশ্নটা তোলা যেতে পারে। ভারতের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ তার অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, তারা সংগ্রাম করছে তাদের রাষ্ট্রীয় বা জাতিগত পরিচয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তাই আমাদের সংগ্রাম, আমাদের ইতিহাস তাদের সেই সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করবে। আমরা জনগণের সঙ্গে জনগণের ঐক্যের ক্ষেত্রে দাঁড়াবো ভারতের সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা হবে জনগণভিত্তিক, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা হবে জনপ্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। আমরা ছোট দেশ হিসেবে উদারহণ দিতে পারি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পার্শ্বে অবস্থিত কিউবা, চীনের পাশে ভিয়েতনাম-এর। আমাদের বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যদি জনগণের শক্তি অর্জনের মধ্য দিয়ে, ক্ষমতায়নের মধ্য দিয়ে অর্জন করা যায়, তবে বাংলাদেশ হবে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে দুর্ভেদ্য রাষ্ট্র।

www.pathagar.com

মেজর জেনারেল (অবঃ) কাজী গোলাম দস্তগীর, পিএসসি*

পাদুয়ার ঘটনা বিডিআর নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঘটিয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকার এর দায়িত্ব বহনে রাজী নয় — এ প্রচারণার জবাবে বিডিআর-এর একজন সাবেক মহাপরিচালক হিসেবে আমি নিশ্চিত যে, সরকারের অনুমতি ছাড়া বিডিআর এই সিদ্ধান্ত নেয়নি। ভারতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার বিডিআর-এর মহাপরিচালক সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা ভারতের অনুভূতিরই প্রতিধ্বনি এবং তা আমাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। আমি দাবী জানাচ্ছি, এক্ষুণি তাকে প্রত্যাহার করা হোক। আমি প্রস্তাব করছি, শুধু কয়েকজন নয়, ঐ বিওপি-র সমস্ত সদস্যকে পুরস্কৃত করা হোক এবং বিওপি কমান্ডারকে বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত করা হোক।

জনাব সাদেক খান

আমি প্রথমেই জেনারেল দস্তগীরের বক্তব্যের সঙ্গে একাত্মতা ব্যক্ত করতে চাই। তিনি জোরালোভাবে আমাদের অনুভূতিরই প্রতিধ্বনি করেছেন। রৌমারীতে বিডিআর-এর যেসব জওয়ান শহীদ হয়েছে, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের সকলকেই সম্মানিত করতে হবে। সীমান্তবাসী যারা যুদ্ধে শরীক হয়েছে, তাদেরও পুরস্কৃত করতে হবে। তাদের জানমালের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। হামলাকারীদের প্রাণ দিয়ে প্রতিহত করা কোনো অপরাধ নয়। ভারতের মন রক্ষার জন্য বাংলাদেশের যেসব কূটনীতির দূত বিডিআর-কে দোষী মেনে নিয়ে সরকারের সাফাই গেয়েছেন, তাদের শাস্তি হওয়া উচিত।

গত তিরিশ বছর ধরে ভারতের ব্যবহার, সীমান্ত সংঘর্ষের অভিজ্ঞতা, রৌমারীর হামলা — এ সব প্রমাণ করে ভারত আমাদের কি দৃষ্টিতে দেখে। ভারতীয় আধিপত্যের আওতায় আমরা কিছু ব্যর্থ রাষ্ট্র (failed state), যাদেরকে ভারতই দেখাশুনা করবে, আশেপাশের ছোট দেশগুলোর প্রতি ভারতের আচরণ এ রকম। এখন ভারতীয় পণ্ডিতরা অনেকেই স্পষ্ট বলছে, বাংলাদেশের কোনো মর্যাদার অধিকার নাই। অথচ মর্যাদার জন্যই ছিল বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম।

সম্প্রতি উত্তর-পূর্ব ভারতের একজন ব্যবসায়ী বলছিলেন, ভারত সরকার বাংলাদেশকে চিনতে ভুল করছে। বাংলাদেশের কিছু কিছু নেতার ভাবভঙ্গী দেখে দিল্লীতে বসে ভারত মনে করে ওরাই বাংলাদেশ, যা ঠিক নয়। বাংলাদেশের মানুষ সহজ সরল হতে পারে, কিন্তু তাদের স্বাধীন মর্যাদায় আঘাত লাগলে তারা

www.pathagar.com

ফুঁসে উঠবে। আমি বলবো, বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র দেখানোর জন্য ভারত অনেকদিন ধরেই নানা তৎপরতা, নানা প্রচার চালাচ্ছে। বাংলাদেশ অকেজো ও পরমুখাপেক্ষী, তাই প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ নিষ্কর্মা বাংলাদেশী ঘর ছেড়ে এসে ভারতের বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে — ভারতে জোরেশোরে এ সব তত্ত্বালোচনা ও অপপ্রচার চলছে। রৌমারীতে বাংলাদেশের বিওপি দখলের চেষ্টা, মর্টার হামলা, সীমান্তবাসীদের উপর অত্যাচার — এ সবই বাংলাদেশের মাথা হেঁট করার তৎপরতা।

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মি. আর্মিটেজ ভারত সফরে এলে তাকে ভারত সরকার বলেছে যে, চীন ও পাকিস্তানকে ঠেকাতে ভারত ওয়াশিংটন ও মস্কোর সঙ্গে ঐক্য গড়তে চায়। মার্কিন মিসাইল ডিফেন্স কর্মসূচীকে ভারত সমর্থন দেবে। এদিকে ভারত মহাসাগরে ভারতই থাকবে মহাশক্তি। ভারতের এসব উচ্চাকাঙ্ক্ষায় আমরা বাদ সাধার কেউ নই। কিন্তু আমাদের গায়ে হাত পড়লে আমরা অবশ্যই পাল্টা আঘাত করবো। আত্মরক্ষার জন্য আমাদের পাল্টা আঘাত হানতে তৈরী থাকতে হবে। ভারত আমাদের টার্গেট করলে আমরাও ভারতের দুর্বল জায়গাগুলোকে টার্গেট করবো।

প্রফেসর ইউ এ বি রাজিয়া আক্তার বানু

The Indian Times-এর একটি নিবন্ধ নিয়ে আমার সহকর্মীদের আলোচনার সময়ে কারো কারো মত ছিল যে, বড় দেশের পাশে ছোট দেশগুলোর ভাগ্য বাংলাদেশের মতোই হয়। কেউ কেউ খুব প্রতিবাদ করছিলেন যে — সুইজারল্যান্ড, ইসরাইল, সিঙ্গাপুর — এরা ছোট দেশ হওয়া সত্ত্বেও আত্মরক্ষা করছে এবং এদের গণপ্রতিরোধ বাহিনী (citizen army) রয়েছে। ইসরাইলের কথায় কেউ কেউ বললেন যে, ইসরাইলের কথা আলাদা, বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশটি তাকে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব রাজনীতিতে নানা রকম পরিবর্তন হচ্ছে। আমরাও তো ঐ রকম একটা বড় শক্তির সাথে একত্রিত হয়ে প্রতিরোধের দ্বিতীয় শক্তি গড়ে তুলতে পারি। আমরা দেখছি যে, একটা মিত্রশক্তি খোঁজার জন্য চীন এই এলাকায় তীক্ষ্ম নজর রাখছে।

মোঘল সম্রাট বাবর বাংলাদেশ সম্পর্কে বলেছিলেন যে, "বঙ্গের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে প্রবঞ্চনার ভয়, যদি তুমি তোমার শত্রুকে নিধন না কর তবে অবশ্যই সে তোমাকে নিধন করবে।" বাঙালিরা রগচটা এবং অনেকেই বলে যে বাঙালিরা

www.pathagar.com

সবচাইতে বেশী বিশৃঙ্খল জাতি। তারপরেও কিন্তু ইতিহাসে যখন একটা মাৎস্যন্যায় অবস্থা চলছিল, বাংলাদেশে তখন বাঙালিরা একটা গোপাল খুঁজে পেয়েছিল। আমরা একটা গোপালের অনুসন্ধান করছি এবং যদিও না পেয়ে থাকি তবে এই রৌমারী এবং পাদুয়ার ঘটনায় একটা গোপালের যেন আমরা ইঙ্গিত পেয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এমন একটা মেরুকরণ ঘটেছে যার কারণে জাতীয় ঐক্য পরবর্তী একটি সমজাতীয় জাতি (homogeneous nation) আমরা পেয়েছিলাম যা আমরা ধরে রাখতে পারিনি। এই ঘটনায় আমরা পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একটা লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায়, তখন প্রয়োজনে বাঙালি সঠিক রায় দেয়, যেমন '৪৭-এ, '৫৪-তে, '৭১-এ সঠিক রায় দিয়েছে, আবার প্রয়োজন হলে সঠিক রায় দেবে। এবং গণপ্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলে আমরা সেই রায়কে কার্যকরী করতে পারি এবং সেই গোপালকে খুঁজে পেতে পারি।

জনাব আবুল আহসান*

সামরিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকে ভারত দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় শক্তি। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর প্রত্যেকের সাথে সীমানা থাকায় ভৌগলিক অবস্থানগত কারণেই এদের প্রত্যেকের কাছে ভারত সব সময়ই সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়ে। ঐতিহাসিক কারণেই বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের মনোভাব এবং ভারতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মনোভাব, দুঃখজনক হলেও, এক নয়। সে কারণে এ ধরনের সম্পর্কের মধ্যে কখনো কখনো সমস্যার সৃষ্টি হয়। আমাদের পররাষ্ট্রনীতিতে, বিশেষ করে ভারতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, একটি অভিন্ন কৌশল প্রণয়ন করা জরুরী। দেশের অভ্যন্তরে ও বহির্বিশ্বে মূল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ থাকার ভাবমূর্তি আমরা গড়ে তুলতে পারিনি। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে চিন্তা করার এখনই সময়। বাংলাদেশের মতো একটি দেশের অবস্থানে থেকে ভারতের সাথে শান্তি ও সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রাখার কোনো বিকল্প আমাদের সামনে নেই। প্রথমত, এটি দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং দ্বিতীয়ত, এই বিষয়টি বাদ দিয়ে আমরা কোনো নীতি প্রণয়ন করতে পারি না। সেক্ষেত্রে হয় আমরা বাস্তবতা বিবর্জিত বলে বিবেচিত হব, নয়তো জাতীয় স্বার্থের প্রতি সঠিক গুরুত্ব দেয়ার ব্যাপারে আমাদের উদাসীনতা রয়েছে বলে প্রমাণিত হবে। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেশের নিরাপত্তা, ভূখণ্ডগত সার্বভৌমত্ব অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি

www.pathagar.com

বিষয়। ১৯৭৪ সালের চুক্তির পর চুক্তির বিষয়বস্তু যতটা গুরুত্ব পাবার অধিকারী ছিল, ভারত ও বাংলাদেশ কোনো পক্ষ থেকেই ততটা গুরুত্ব দেয়া হয়নি। ভারতের সাথে অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তিন বিঘা করিডোর নিয়ে দীর্ঘদিনের সমস্যা বর্তমানে মোটামুটি বিতর্কের উর্ধ্বে। পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে যে সমস্যা, '৭৪-এর সীমান্ত চুক্তিতে তা যে পরিমাণ গুরুত্ব পাবার দাবীদার ছিল, তা পায়নি। ভারতের সাথে এখন পর্যন্ত যত গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, তাদের মধ্যে সীমান্ত চুক্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর বাস্তবায়ন না হওয়ার জন্য ভারতের ইচ্ছাকৃত ধীরে চলা নীতিই দায়ী। সন্দেহ নেই আমরা শান্তিপূর্ণ এবং স্থিতিশীল সীমান্ত চাই, চাই আমাদেরকে সমদৃষ্টিতে দেখার ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হোক, আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হোক। '৭৪-এর চুক্তির মাধ্যমে উভয় দেশ যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে তার বাস্তবায়নের দাবী আমাদের সকলের।

অধ্যাপক তারেক শামসুর রেহমান

শুধু সীমান্ত সমস্যা সমাধান করলেই ভারত-বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান হবে না। যেখানে ভারতের সাথে আমাদের ২৫০০০ কোটি টাকার বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে, যেখানে ভারত আমাদের ট্রানজিট চাচ্ছে, যেখানে তালপট্টি নিয়ে আমাদের সমস্যা রয়েছে ভারতের সাথে এবং যেখানে ভারত বলছে যে, বাণিজ্য উদ্বৃত্তি কমানোর জন্য চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহার করতে দিতে হবে — আমার মনে হয়, এই বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করা উচিত এবং ভবিষ্যতের যে কোনো সেমিনারে এ বিষয়গুলো সামনে আনা উচিত। অর্থাৎ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের আরো অনেকগুলো বিষয় রয়েছে এবং এ বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।

জনাব ইশতিয়াক আজিজ উলফাৎ

'৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত আমাদের সাহায্য করেছে — কথাটা সত্য, কিন্তু তাদের কি কোনো স্বার্থ কিংবা ভূখণ্ডগত কোনো উদ্দেশ্য ছিল না? আমাদের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানকে ভাঙার ভারতের বহুদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিয়েছে। পরবর্তীতে তারা আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় ব্যবসায়িক অংশীদার হিসেবে আর্বিভূত হয়েছে। কিন্তু এই ব্যবসায়িক সম্পর্কের মধ্যে বিরাট একটা

www.pathagar.com

বৈষম্য রয়ে গেছে, যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে। এই দুই দেশের 'মিত্র' সম্পর্কের মধ্যে আরেকটা ভয়াল চিত্র রয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে, গত তিরিশ বছরে বিএসএফ প্রায় ৫০০ গ্রামবাসী আর প্রায় ১০০ বিডিআর সৈন্যকে হত্যা করেছে। কথায় বলে, with friends like these who needs enemies? কাজেই মিত্র শব্দটি কিভাবে ব্যবহার হবে এটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করার সময় এসেছে। একটা প্রাণও কেন নষ্ট হবে বেঘোরে? এটা যদি পশ্চিমের কোনো দেশে হতো, তাহলে এটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হতো, অনেক রকম প্রতিবাদ আসতো। কিন্তু তিরিশ বছর ধরে প্রাণহানি হচ্ছে, এদের মানবাধিকার, এদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, এদের ক্ষতিপূরণ কে দেবে? কোত্থেকে আসবে? — এদের নিয়ে চিন্তা করার সময় এসেছে। আজকে তিরিশ বছর পরে আবার আমাদের পররাষ্ট্রনীতি নিয়েও নতুন করে ভাববার, কে 'মিত্র' আর কে 'শত্রু' — এটা নিয়ে বিশ্লেষণ করার সময় এসেছে। হয়তো ঘুমিয়ে থাকবার বা মিত্রতার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকবার সময় শেষ হয়েছে। আমরা স্পষ্ট ভাষায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সবাইকে, এই দেশটা একটা রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জন্ম নিয়েছিল, কেউ দয়া করে, কারোর দাক্ষিণ্যে আমরা এই দেশটা পাইনি। আপনাদের সাথে বন্ধুত্বের জন্য আমরা তৈরী, কিন্তু সেটা হতে হবে পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে। '৭১-এ আমরা পাশাপাশি যুদ্ধ করেছিলাম। আমরা ছোট হতে পারি, কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে বড়ভাইসুলভ আচরণ আশা করি না। সিকিম-ভুটান-নেপাল আর বাংলাদেশ এক নয়।

অধ্যাপক আব্দুল লতিফ মাসুম

বাংলাদেশের স্বাধীনতা মুহূর্তে লিফৎসুলজ বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে বলেছিল *অসমাপ্ত বিপ্লব*, আর আমি বাংলাদেশের সীমান্তকে বলতে চাই *অসমাপ্ত সীমান্ত*। ১৯৪৭-এর Independence Act অনুযায়ী হিন্দুপ্রধান এলাকা নিয়ে হিন্দুস্থান এবং মুসলিমপ্রধান এলাকা নিয়ে পাকিস্তান হয়েছিল। আমার কাছে এখনো প্রশ্ন যে, ভারতের উত্তর-পূর্বঞ্চলের আদিবাসী অধ্যুষিত ৭টি প্রদেশ, যা সেভেন সিস্টারস্ নামে পরিচিত এবং বঙ্গোপসাগরের আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, এ এলাকাগুলো ভারত কিসের ভিত্তিতে তাদের নিজেদের অধিকারে রাখতে চাইছে যেখানে দক্ষিণ এশিয়ায় বহু-জাতি তত্ত্বের ধারণা বিদ্যমান? '৪৭-এর পূর্ব ইতিহাসে দেখা যায়, এ সব এলাকা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ছিল। ভারতীয় সীমানাভুক্ত হওয়ার পর থেকেই এ সব এলাকায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অহরহই ঘটে

www.pathagar.com

চলেছে। ভারত এমন প্রচারণাও চালাচ্ছে যে, বাংলাদেশ এ সব এলাকায় সংঘটিত গেরিলা যুদ্ধে মদদ যোগাচ্ছে। এ সব অপপ্রচারের অর্থ হলো সে দেশের সাধারণ মানুষের মনে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করা যা সীমান্ত সংঘর্ষ সংক্রান্ত প্রচারণার ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করেছি। এর ফলে দু'দেশের সম্পর্কের ক্রমাবনতি ঘটছে যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

জনাবা মাহমুদা আখতার জাহান হীরা

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত রেখা চিহ্নিত করেছেন র‍্যাডক্লিফ। অধিকাংশ সীমান্তে প্রাকৃতিক বিভেদ রেখা বলতে কিছুই নেই, র‍্যাডক্লিফ সাহেব ঘটনাস্থল পরিদর্শনও করেননি, তিনি মানচিত্রে দাগ দিয়েই গেছেন মাত্র, ফলে কয়েক'শ ছিটমহল নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং ঐ ছিটমহলগুলোর অধিবাসীদের হতে হয়েছে অবর্ণনীয় দুর্ভোগের শিকার। বিএসএফ-এর শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তের অশান্ত এলাকা, যেমন পাদুয়া এবং বড়াইবাড়ি থেকে বাঙালিরা ঘরবাড়ি ছেড়ে দেশের অভ্যন্তরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এই পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে সীমান্ত এলাকার চাষাবাদযোগ্য জমি অযোগ্য হয়ে উঠবে এবং বিস্তীর্ণ এলাকায় খাদ্য ঘাটতি দেখা দেবে। কাজেই, ভারতের সঙ্গে আমাদের সীমান্ত সমস্যাগুলো মিটিয়ে ফেলার পরিবেশ সৃষ্টি করতে দলমত নির্বিশেষে সবারই এগিয়ে আসা উচিত।

জনাব মীজানুর রহমান আপেল

সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এখনো বিএসএফ-রা অত্যাচার করছে আমাদের জনগণের উপর। এটা ঠিক পত্রিকায় উঠছে না, তার কারণ সাংবাদিকদের দৃষ্টিতে এটা অনেক সময় ছাপানোর মতো কোনো খবর নয়, কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই এটা জীবনধারণের ক্ষেত্রে মানুষের উপরে একটা অত্যাচার। সেই অত্যাচার যে শুধু এখন চলছে তাই নয়, ছিটমহল নিয়ে আমরা যারা অনেক আগে থেকে লেখালেখি করি তারা জানি, এই সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোর অধিবাসীদের প্রতি মুহূর্তে বন্দুকের নলের মুখে জীবন যাপন করতে হয়, তাদের ঘরের কাজ করতে হয়, তারা প্রতি মুহূর্তে ধর্ষিত হচ্ছে, মৃত্যুবরণ করছে। সেই সব মানুষকে ভালোভাবে থাকার জন্য যদি আমরা কিছু করতে পারি তবে সেটাই হবে আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন। আমি আহ্বান জানাবো, আসুন আমরা কিছু করি তাদের জন্য। পাশাপাশি আমি খুব করে বলবো যে, ভারতের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যদি

www.pathagar.com

আমাদেরকে কিছু করতে হয় তাহলে আমাদের নেপালের দিকে তাকাতে হবে, কিভাবে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনে নেপালবাসীদের থাকতে হয়। তারাও এখন প্রতিরোধ করছে। পাশাপাশি নেপালে আগে যেমন ভারতীয় এবং নেপালী উভয় মুদ্রা পাশাপাশি চলতো, সেই নেপালের কোনো বিক্রেতা এখন ভারতীয় মুদ্রা নিতে চায় না। তারা ভারতের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এমনভাবেই ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। যেখানে রাজনীতিবিদরা পারছে না, যেখানে সামরিক আমলারা পারছে না, সেখানে নেপালের জনগণ দেখিয়ে দিয়েছে কিভাবে প্রতিরোধ করতে হয়।

মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন আহমদ, বীর বিক্রম, এমপি

কিছুদিন আগে ভারতের সাথে পাকিস্তানের একটি ছোটখাট সংঘর্ষ হয়ে গিয়েছে, যেটি 'কারগিল ক্রাইসিস' নামে পরিচিত। যেদিন ক্রাইসিসটি শুরু হলো, তার ৬ ঘন্টার মধ্যে আমরা দূরদর্শনে দেখতে পেলাম প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী বিরোধীদলীয় নেত্রী সোনিয়ার সাথে একান্ত বৈঠক করছেন জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ে। আমরা অত্যন্ত দুর্ভাগা জাতি। প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে সম্পর্কের অবনতির কারণে আজকে প্রয়োজনীয় মুহূর্তেও আমরা জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে পারিনি। বাংলাদেশের ইতিহাস যদি আপনারা দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন, এ দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব কখনই জনগণকে পথ নির্দেশ করতে পারেনি। কিন্তু এ দেশের সংগ্রামী জনগণ নিজের বিচার-বুদ্ধি খাটিয়ে প্রত্যেকটি সঙ্কট কাটিয়ে উঠেছে। একাত্তরে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার মনে লেশমাত্র দ্বিধা নেই যে, এই দেশকে ভারত কেন, আরও বড় প্রতিবেশীর আক্রমণ থেকেও জনগণই রক্ষা করবে। তবে দুঃখ লাগে, আমাদের দেশ আক্রান্ত হয়, আমাদের সাহসী বিডিআর সৈনিকরা নিহত হয়, কিন্তু আমার দেশবাসী এই সংবাদ বাংলাদেশ টেলিভিশন কিংবা বাংলাদেশ বেতারে জানতে পারে না। ভারতের টেলিভিশন খুলে আমাদেরকে জানতে হয় যে, আমার দেশের ভূমি করতলগত হয়েছে। আমার মনে হয়, এ দেশের জনগণ অন্তরের অন্তস্থল থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছে এই বীর বিডিআর সৈনিকদেরকে। আমি এই প্রস্তাবের সাথে একমত যে, তাদেরকে বীরত্বসূচক পুরস্কার দেয়া হোক। সারা দেশের মানুষ এটি চায়, তার সাথে শুধু যোগ করবো যে, বিডিআর সৈনিকদের যে পুরস্কার দেয়া হবে তার চাইতে এক ধাপ উপরে যেন রৌমারীর সাইফুল ইসলামকে একটি পুরস্কার দেয়া হয়। এ দেশে এখন প্রয়োজন রৌমারীর সাইফুল ইসলামের মতো তের কোটি মানুষের, যারা দৃঢ় পদক্ষেপে এই দেশের মাটিকে রক্ষা করবে সকল সঙ্কটময় মুহূর্তে। আমি সমর্থন

www.pathagar.com

জানাতে চাই, আমাদের দেশের নীতিতে এখন আনতে হবে, সকলকে বাধ্যতামূলক সামরিক ট্রেনিং দেয়া হোক। তিরিশ বছরে আমাদের যে অভিজ্ঞতা, তাতে সব সময়ই আমরা অবহেলিত হয়েছি। আমরা সুবিচার চাই, শান্তিতে থাকতে চাই। আমরা আমাদের জনগণকে সামরিক বিদ্যায় সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলবো, যাতে করে নিজের আত্মরক্ষা তারা নিজেরাই প্রয়োজনে করতে পারে। আমাদের প্রতিরক্ষার প্রথম লাইন হওয়া উচিত আমাদের একটি পররাষ্ট্র নীতি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের পররাষ্ট্রনীতি যথেষ্ট সবল নয়। তাই আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কূটনীতিকদের হতে হবে দেশের অত্যন্ত মেধাবী ব্যক্তি, সুশিক্ষিত, তাদের মনে সকল কিছুর উর্দ্ধে থাকবে দেশপ্রেম। মন্ত্রীসভায়ও এ ধরনের একজন ব্যক্তিত্ব আমাদের চাই, যিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশসমূহের সাথে এমন একটি সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবেন যা আমাদের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করবে। আমরা পারমাণবিক অস্ত্রধারী ভারতের সাথে যুদ্ধ করার কথা চিন্তাও করি না, কিন্তু আমরা নিজেদের রক্ষা করতে চাই। বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ এবং পররাষ্ট্রনীতির পরে স্বভাবতই আসে জাতীয় ঐক্যের প্রশ্ন। সীমান্ত সংঘর্ষ বা কোনো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্যে জাতীয় ঐক্যই হতে পারে আমাদের প্রধান রক্ষাকবচ। তাই সেই রক্ষাকবচ এ দেশের জনগণকেই গড়ে তুলতে হবে। রাজনীতিকদের উপর সবকিছু ছেড়ে দেবেন না, সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব বেছে নিন এবং দেশের ক্রান্তিকালে, দেশের জন্য যারা আপনাদের জন্য নিরাপত্তা বেষ্টনী হিসেবে কাজ করবেন বলে মনে হয়, সে ধরনের ব্যক্তিত্বকে নেতৃত্বের আসনে বসাবেন। (তবে দুঃখ লাগে) এতোবার 'সরি' বলার কোনো দরকার নেই, আমরা কোনো অপরাধ করিনি। দেশের ৫০০ গজ ভিতরে আমার দেশের জওয়ানের লাশ পড়ে থাকবে, তার জন্যে সরি বলার কি আছে? 'সরি' তারা বলবে, যারা আমার দেশে অন্যায়ভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। তাই আজকে প্রতিটা নাগরিককে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে হবে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকেও বুঝিয়ে দিতে হবে যে, এই ধরনের অনুগত রাজনীতি, এই ধরনের আপোষকামী রাজনীতি বাংলাদেশের জন্য মঙ্গলকর নয়। আমি বিডিআর-এর মহাপরিচালক এবং প্রতিটি সৈনিককে তাদের দৃঢ় ভূমিকার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লেঃ কর্নেল (অবঃ) মুহাম্মদ ফারুক খান, পিএসসি, এমপি

আমার মনে হয়, সীমান্তের এই ঘটনাটা একটা খুবই সাধারণ ঘটনা যেটা সীমান্তে ঘটে থাকে। একটা অপদখলীয় জমি পাদুয়াতে বিএসএফ অবৈধভাবে রাস্তা

www.pathagar.com

বানাতে গেলে বিডিআর প্রথমে মৌখিকভাবে, পরে ফ্ল্যাগ মিটিং-এর মাধ্যমে এর প্রতিবাদ জানিয়েছে। এতে কাজ না হওয়ায় বিডিআর স্ব-শরীরে গিয়ে নির্মাণ কাজ বন্ধ করতে বলার পর তারা নির্মাণ কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। বিএসএফ প্রতিশোধ নেয়ার জন্য খুঁজেছে ঐ ধরনের জায়গা, বরাইবাড়ি কিন্তু সেই ধরনেরই অপদখলীয় একটি এলাকা, যেখানে ভারতীয় কিছু জমি আমাদের দখলে আছে এবং সেখানে আমাদের একটা ক্যাম্পও আছে। সুতরাং, দর কষাকষি করার জন্য তারা এই ক্যাম্পটাকে বিএসএফ দখল করার পরিকল্পনা করেছে। তবে খুবই দুর্বল পরিকল্পনা ছিল, তারা জানে না বিওপি-টা কোথায়, অথচ যে কোনো যুদ্ধে গেলে আমরা এ সব পরিকল্পনা আগে থেকে সাজিয়ে নেই। ভারতীয় সৈন্য এসেছে — এই খবরটা তাদেরকে দিয়েছিল মিনহাজ নামে একজন গ্রামবাসী। সেই মিনহাজের খবরে বিডিআর সতর্ক হয়েছে, ভারতীয় সৈন্য ৩০০ গজের মধ্যে এলে বিডিআর-এর গুলিতে ১৬ জন ভারতীয় সৈন্য মারা গেছে। এই যুদ্ধে আমার নির্বাচনী এলাকার একটি ছেলে জাহেদুন্নবী অংশগ্রহণ করেছে, সে এখন আহত অবস্থায় ঢাকা সিএমএইচ-এ আছে। আমি তিনবার পুরো যুদ্ধের ঘটনা তার কাছে শুনেছি। পরের দিন খবর আসার পর বিডিআর-এর ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার লেঃ কর্নেল শাহেরুজ্জামান সেখানে অতিরিক্ত সৈন্য নিয়ে গেছেন। বিকেল ৫টা পর্যন্ত যুদ্ধ চলেছে, তারপর বিএসএফ ফিরে গেছে। শাহেরুজ্জামান আমাকে জানিয়েছে যে, ১৮ থেকে অনেক বেশী সৈন্য আহত বা নিহত হয়েছে, যাদেরকে নিয়ে যেতে পারেনি তাদের ফেলে যেতে বাধ্য হয়েছে। ভারতীয় সৈন্যদের দেহ বিকৃত করা হয়েছিল কিনা আমি জানি না, তবে মৃতদেহ সারাদিন সারারাত জমিতে পড়েছিল, পরের দিন মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে ফ্ল্যাগ মিটিং-এর পরে। অনেকে সরকারকে দোষী করার চেষ্টা করেছেন, সরকারকে তারা কোনো সুযোগই দেননি। বিডিআর তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে। বাংলাদেশের সরকার সব সময়ই তাদের সমর্থন দিয়েছে। বিকেল ৩টার মধ্যে হেলিকপ্টার গেছে আহতদের নিয়ে আসার জন্য। পরবর্তীতে সরকার পররাষ্ট্র বিষয়ক সচিবের মাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছে। যখন দেখা গেল ঘটনাটিকে, বিশেষ করে ভারতীয় পত্রপত্রিকায় অনেক বড় করে দেখানোর চেষ্টা চলছে, এর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ মারা যাওয়ায় উনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এই ঘটনার নিজে তদন্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকেও তদন্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন। আমি নিশ্চিত যে, বাজপেয়ী বিএসএফ-এর প্রধানকে জিজ্ঞেস করার পর যখন জেনেছেন যে, বাংলাদেশের ৫০০ গজ ভিতরে তাদের মৃতদেহ পড়েছিল তখন আর কিছু

www.pathagar.com

বলেননি। ১৮ জন সৈন্য মারা গেছে বলে খবরটা বেশী ছড়িয়েছে এবং পরবর্তীতে দুঃখজনক হলেও ভারতীয় কিছু পত্রপত্রিকা, কিছু ব্যক্তি, বাংলাদেশের কিছু ব্যক্তি এটাকে একটা বিরাট ঘটনা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছে। বারবার খবরের কাগজে আসছে যে, ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশ ঘেরাও করে ফেলেছে। কিছুদিন আগে প্রতিরক্ষা কমিটির মিটিং-এ আমি ডিজিএফআই প্রধানের কাছে বাংলাদেশের চারদিকে ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন করার কারণ সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চেয়েছিলাম। জে. নজরুল যে উত্তর দিয়েছেন তা হলো, আমাদের দেশের চারিদিকে ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে হয়তো ভারতের নির্বাচনের জন্য। সুতরাং আমি মনে করি, আমরা এটা নিয়ে খুব একটা বড় ঘটনা ঘটাবার চেষ্টা করেছি। আমাদের সরকার খুবই দৃঢ়তার সাথে এ ঘটনার মোকাবেলা করেছে। সামনে নির্বাচন। তাই ভারতীয় সরকার আর বড় বড় রাজনীতিবিদগণ ১৮ জন সৈন্য মারা যাবার ঘটনা নিয়ে গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে এটাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে।

এখানে জাতীয় ঐক্যের কথা বলা হচ্ছে, দেশের উন্নয়ন দেশের রাজনীতি ইত্যাদি ব্যাপারে জাতীয় ঐক্যের কথা বলেছেন আমাদের সরকারও। বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীকে ও বিডিআর-কে প্রয়োজন অনুসারে তৈরী করা হয়েছে, এবং প্রয়োজনে জনগণকেও তৈরী করা হবে। মাঝে মাঝে আমাদের দেশের কিছু কিছু ব্যক্তি বলেন যে, বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনীর দরকার নেই, এর আধুনিকায়নের দরকার নেই। আমার মনে হয়, তারা আজকে বুঝতে পারবেন যে প্রত্যেকটা দেশে সশস্ত্র বাহিনী থাকার প্রয়োজনিয়তা কোথায়। আমরা কুয়েত হতে চাই না। ইরাক যেভাবে কুয়েত দখল করে নিয়েছিল, শ্রীলংকায় যেমন ভারতীয় সৈন্য ঢুকে পড়েছিল, বাংলাদেশে তেমনটি ঘটতে পারেনি। ভারতকে এটা বুঝতে হবে যে বাংলাদেশ উপযুক্ত সম্মান নিয়েই টিকে থাকতে চায়। অনেকে বলেছেন যে, বিডিআর-কে সরকারের পক্ষ থেকে অভিনন্দিত করা হয়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই প্রত্যেকদিন খবর নিয়েছেন। আমরা সবাই জানি, বীরত্বসূচক পদক কোনো একটা ঘটনার পরে দেয়া হয়, সেটা তাৎক্ষণিকভাবে পিন মেরে দেয়া হয় না। নিশ্চয়ই যার যার অবদান অনুযায়ী পদক দেয়া হবে। শুধু তাই নয়, সীমান্ত রক্ষায় বিডিআর-এর যে সমস্ত সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে, সেগুলো যথাসময়ে প্রতিকার করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

www.pathagar.com

আলোচনায় উপস্থিত আলোচকবৃন্দের তালিকা ও পরিচয়

১. **মেজর জেনারেল (অবঃ) এজাজ আহমেদ চৌধুরী, পিএসসি**
জুন ১৯৯৬-এ অবসরের অব্যবহিতপূর্বে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রাইফেলস

২. **জনাব আবু সাঈদ খান**
সংবাদদাতা (বাংলাদেশ ও নেপাল), ইএমসি

৩. **জনাব ফেরদৌস আহমদ কোরেশী**
সম্পাদক, দৈনিক দেশবাংলা

৪. **প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ**
রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং প্রাক্তন উপাচার্য ঢাকা শ্বিবিদ্যালয়

৫. **এ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম**
প্রকাশক, *দৈনিক যুগান্তর*

৬. **জনাব মিজানুর রহমান খান**
সহকারী সম্পাদক, *দৈনিক যুগান্তর*

৭. **প্রফেসর দিলারা চৌধুরী**
সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

৮. **জনাব আনোয়ার হাশিম**
প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এবং জেনেভা ও ভিয়েনায় জাতিসংঘে বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি

৯. **জনাব সাইফুল ইসলাম (লাল মিয়া)**
পল্লী চিকিৎসক, রৌমারী সীমান্তে বিডিআর-বিএসএফ সংঘর্ষে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী

১০. **জনাব আব্দুল হক**
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর – হক'স বে লিঃ, ঢাকা এবং পরিচালক, সার্ক চেম্বার এ্যান্ড কমার্স

১২. **জনাব আবুল হাসনাত মঞ্জুরুল কবীর**
ল-ডেস্ক ইনচার্জ, *দ্য ডেইলি স্টার*

১২. **মেজর (অবঃ) আখতারুজ্জামান**
সাবেক সংসদ সদস্য

১৩. **প্রফেসর আফতাব আহমাদ**
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৪. **জনাব এম সফিউল্লাহ**
প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত

১৫. **জনাব মাহমুদুল ইসলাম**
সাংবাদিক, *দৈনিক জনকণ্ঠ*

১৬. **জনাব সায়ফুল হুদা**
সাংবাদিক, ইউএনবি

www.pathagar.com

১৭. **ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন**
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি, *দৈনিক ইত্তেফাক*

১৮. **ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) এম সাখাওয়াৎ হোসেন, এনডিসি, পিএসসি**
এককালে বিডিআর-এ কর্মরত সেক্টর কমান্ডার এবং অবসরের পূর্বে ব্রিগেড কমান্ডার, বান্দরবন

১৯. **ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) মিরান হামিদুর রহমান**
মে ১৯৯৬-এ অবসরের অব্যবহিতপূর্বে উপ-মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রাইফেলস

২০. **কমোডর (অবঃ) শফিক-উর-রহমান, পিএসসি**
বাংলাদেশ কোস্টগার্ড-এর প্রথম মহাপরিচালক

২১. **এ্যাডভোকেট আদিলুর রহমান খান**
পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য, **অধিকার**

২২. **মেজর জেনারেল (অবঃ) কাজী গোলাম দস্তগীর, পিএসসি**
সাবেক মহাপরিচালক, বিডিআর এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত

২৩. **জনাব সাদেক খান**
সাংবাদিক

২৪. **প্রফেসর ইউ এ বি রাজিয়া আক্তার বানু**
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২৫. **জনাব আবুল আহসান**
সাবেক পররাষ্ট্র সচিব, বাংলাদেশ সরকার এবং প্রথম মহাসচিব, সার্ক

২৬. **অধ্যাপক তারেক শামসুর রেহমান**
সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

২৭. **জনাব ইশতিয়াক আজিজ উলফাৎ**
মুক্তিযোদ্ধা, ঢাকা মহানগরীর গেরিলা যোদ্ধা 'ক্র্যাক প্লাটুন'-এর সদস্য

২৮. **অধ্যাপক আব্দুল লতিফ মাসুম**
সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

২৯. **জনাবা মাহমুদা আখতার জাহান হীরা**
ফ্রি-ল্যান্স গবেষক

৩০. **জনাব মীজানুর রহমান আপেল**
সহযোগী সম্পাদক, পাক্ষিক চিন্তা

৩১.. **মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন আহমদ, বীর বিক্রম, এমপি**
বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য, ভোলা

৩২. **লেঃ কর্নেল (অবঃ) মুহাম্মদ ফারুক খান, পিএসসি, এমপি**
আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য, গোপালগঞ্জ

www.pathagar.com